A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

মনিব ও তাহার কুকুর

শওকত ওসমান

মনিব ও তাহার কুকুর

শওকত ওসমান

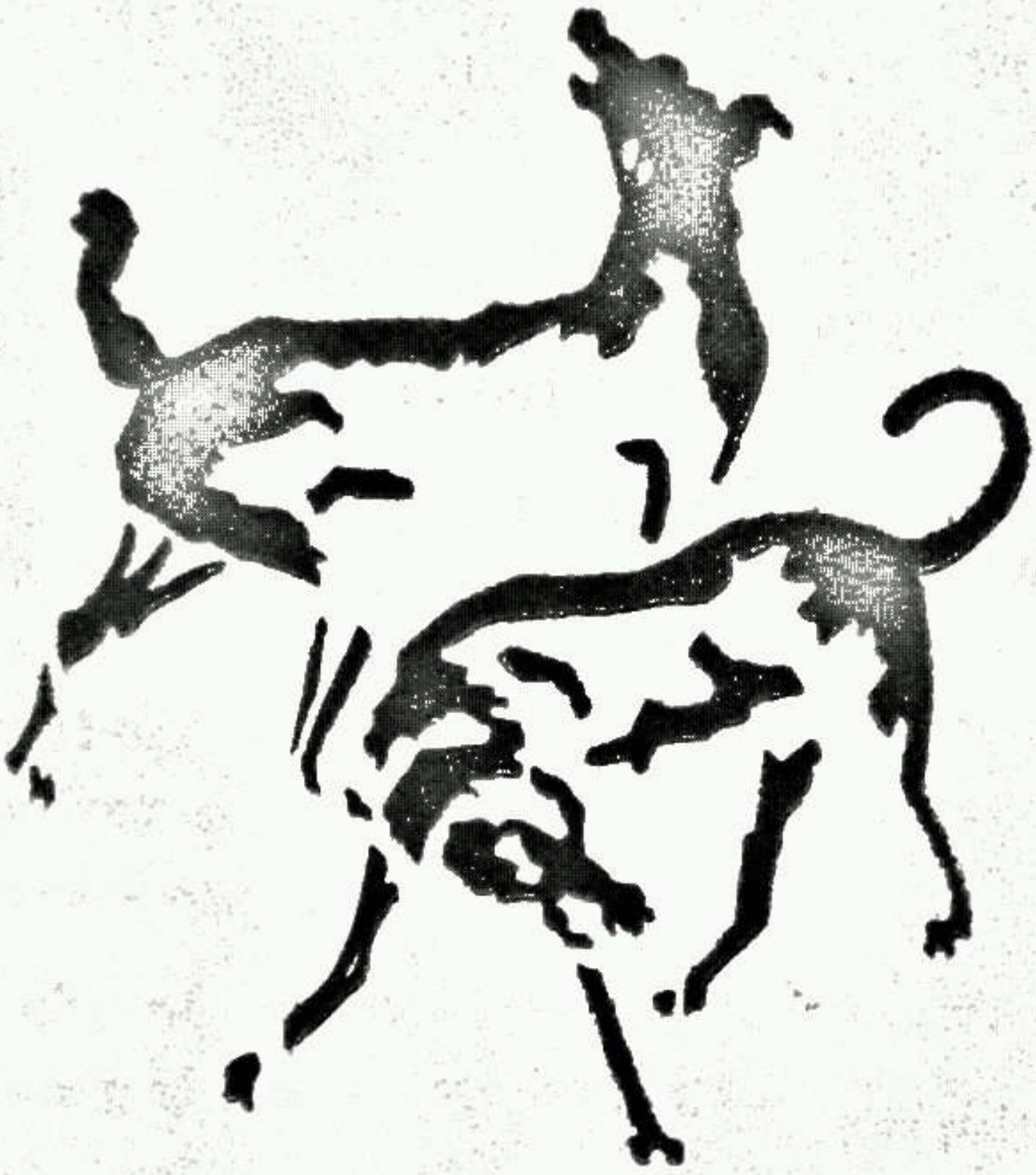

প্যাপিরাস প্রকাশনী
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯৩,
জুন ১৯৮৬।।

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : প্যাপিরাস প্রকাশনী।।
১২, আরামবাগ, ঢাকা-২।।

প্রচ্ছদ : আ, মু, মামুনুর রশিদ।।

মুদ্রক : মোতাহার হোসেন
প্যাপিরাস প্রেস
১৫৯, আরামবাগ, ঢাকা-২।।

মূল্য : পঁচিশ টাকা।

MONIB-O-TAHAR KUKUR
[The Master and his dog : A Collection of Short Stories] by Shaukat Osman. Published by : Papyrus Prokashanee, 92 Arambag, Dhaka-2 Cover design by A. M. Mamunur Rashid and Printed by Motahar Hossain, Papyrus Press, 159, Arambag, Dhaka-2. First edition : June, 1986 Price : US $ 3·00

প্রসঙ্গ কথা

এক যুগ, ঠিক বারো বছর পরে এই নতুন গল্পের বই প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি কাহিনী আরো পূর্বে রচিত। সময় মত বই আকারে বের করা লেখকের দায়িত্ব নয়। সে-দায়িত্ব প্রকাশকের। দুঃখের বিষয়, কালেভদ্রে তেমন কাউ-কে পাওয়া যায়। প্যাপিরাস প্রকাশনীর স্নেহাস্পদ মোতাহার হোসেন এবার এগিয়ে না এলে গল্পগুলো বস্তাবন্দী হয়েই থাকত। ওকে ধন্যবাদ দিতে পারলাম না। সুবাদের জন্য।

আশা করি, পাঠকদের নিকট গল্পগুলো সমাদৃত হবে। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গল্পটি ১৯৬৬ সনে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

একটি ডাহা মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে ৩১ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে। সেখানে 'হল' হবে ইংরেজী 'হেল' বাঙলায় যার অর্থ নরক।

পরিশেষে, প্যাপিরাসের সকল কর্মীগণ-কে আমার স্নেহাশিস জানাই। তাদের আন্তরিকতা অবিশ্যি অপরিশোধ্য ঋণ।

শওকত ওসমান

সূচী পত্র

গ্রহচ্যুত ৯।। কেপ্রাদে ২৭।। মনিব ও তাহার কুকুর ৪০।। গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া ৫১।। মুষ্টিযুদ্ধ লঘুনৃত্য ৬১।। ধর্মের দোহাই জবর ৭২।।

গ্রহচ্যুত

চায়ের টেবিলেই সূচনা।

গোটা পরিবারের সামনে মিরাজ সরকার বলেছিলেন, 'বড় ইচ্ছে একবার তোমাদের সকলকে নিয়ে আমার জন্মভূমি সাগরপুর ঘুরে আসি।'

প্রস্তাব সকলে লুফে নিয়েছিলো। ছোট মেয়ে নাজনী য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী তখনই সামান্য ফুট্ কাটে মাত্র, 'আব্বা, তোমার ওই সাগরপুর যেতে নাকি বেশ হাঙ্গামা'।

'হাঙ্গামা আর কি? কিছু ঘুরে যেতে হয়। কোচে, ট্রেনে ঘণ্টা দুই-দুই। তারপর নৌকায় ঘণ্টা তিনেক। এটুকুই 'টিডিয়াস'। তারপর রিক্শায় একদম বাড়ি পৌঁছে যাবো। ছ-সাত ঘণ্টার ব্যাপার।'

মেয়েই আবার সায় দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'আব্বা, পিক্নিকে একটু হাঙ্গামা না থাকলে ফুর্তি জমে না। আমি ত তখন নিজে রান্না করার পক্ষপাতী। নচেৎ বাবুর্চি লেজে বেঁধে অনেকে পিকনিকে যায়। আমি তেমন—।' নাজনী কথা বলে একটু বেশি। বাবার আদুরে মেয়ে। বাপ সেদিন তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই যোগ করেছিলেন, "শহর ছেড়ে মাঝে-মাঝে ঠাঁই-নাড়া হওয়া উচিত। জাষ্ট্ ফর এ চেঞ্জ।'

সেদিন থেকেই গোটা পরিবার মেতে উঠল।

মিরাজ সরকার সেই সব প্রাবাদিক ভাগ্যবানদের মধ্যে পড়েন, যারা মাটি মুঠোয় নিলে সোনা হয়ে যায়। হয়েছেও তা-ই। চাকরি করছেন ডাগর-ডাগর। তারপর চাকরি ছেড়ে ব্যবসা। সব ক্ষেত্রেই লাফিয়ে-লাফিয়ে তরক্কী। প্রচুর সম্পদ। বংশ লতিকাও মা-শা-আল্লাহ, দুই ছেলে তিন মেয়ে। বড় ছেলে বিদেশে ব্যবসা করে। তার বিদেশিনী বউ। ছোট ছেলে বিদেশে যাবো-যাবো করছে। এম-এ পাস। বড় মেয়ে বিবাহিতা। জামাইয়ের সঙ্গে ষ্টেট্সে আছে তিন বছর। বাকি দুই মেয়ে নাজনী, রাজনী। বয়সে বছর দুই ছোট বড়। কিন্তু অনার্স ক্লাসে ব্যবধান মাত্র এক বছর। হালকিতার বাড়ি অভিজাত এলাকায়। মোটামুটি এই বেষ্টনী থেকে একটা মানুষের ললাটের পরিমাপ কঠিন কিছু নয়।

খুঁত অবিশ্যি বয়স। সত্তর পেরিয়ে গেলে লম্বা বয়স অনেকে কিছু ঘাটো করে ফেলে। তখন নানা রকম মানসিক বুদ্বুদ ভেতরে বুজ্‌কুড়ি বা ভুড়ভুড়ি তোলে। সে ত মানবজন্মের মুচলেকা। নচেৎ সরকার সাহেব, সত্যি ভাগ্যবান পুরুষ। এখনও বেশ সচল স্বাস্থ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেই দেখেন। ছোট ছেলে রমিজ সহকারী হতে পারত। কিন্তু সে রুটিন-বাঁধা কাজে সহজে মাথা-নাক গলাতে রাজি নয়। তার ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে পিতার কোনো চিন্তা নেই, ছেলেরও নেই। 'কেরিয়ার' মানে ত রোজগার, সম্পদ সঞ্চয়। তা বাপই করে যাচ্ছেন। আর করছেন কাদের জন্যে? সুতরাং ওদিকে পিতা-পুত্র কারো দৃষ্টি-পাতের সময় ছিল না। মুরুব্বী ব্যবসা আর সামাজিক মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামান। পুত্রের সময় খামখা যায় না। তার ক্লাব আছে, বন্ধু বান্ধব আছে। পিতা ব্যবসার খাতিরে পার্টি দেন কখনও হোটেলে, কখনও বাড়ির লনে। সেখানে শরাব সরবরাহ করা হয়। পুত্র প্রথমে চোখে স্বাদ গ্রহণ করত। এখন তা জিহ্বায়। সুতরাং সময় বেকার যায় না।

প্রস্তাব দেয়ার পর সরকার সাহেবের ঈষৎ অনুতাপ মনে একবার ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল বৈকি। সাগরপুর যাওয়ার হাঙ্গামা কিছু আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় ঝামেলা, পৈতৃক আমলের বাড়ি। না, তার চেয়ে বলা ভালো পিতামহ আমলের বাড়ি। এককালে অবস্থা ভালো ছিল। বাপের আমলে অন্যান্য শরীকদের সঙ্গে মামলায় মামলায় সর্বস্বান্ত। ভিটে বাড়ি আছে। জমি দু'চার বিঘা যা মাঠে আছে, তা গ্রামের এক জ্ঞাতি ভাই মোবারক মিয়া দেখাশোনা করে। ভোগের অধিকারীও সে। সাবেক কালের টিনের ঘর। অবিশ্যি দেয়াল এবং মেঝে পাকা। তিরিশ কি প্রায় ছত্রিশ বছর মিরাজ সাহেব আর সাগরপুর যেতে পারেননি। তবে আত্মীয়টি ঘর মেরামত বাবদ টাকা বছর বছর নিয়ে যায়। এখন সমস্যা ঘরগুলো, কী অবস্থায় আছে ছেলেমেয়েদের কাছে কেউ ছোট হতে চায় না। এরা শহরে মানুষ। সুবিধা-অসুবিধার মাপকাঠি তাদের নিজস্ব। তবে ছোট মেয়ে নাজনী ঠিকই বলেছে, কিছু হাঙ্গামা মানে কিছু অসুবিধা থাকা ত উচিত। তবু মিরাজ সরকার বেশি ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। তাই তাড়াতাড়ি

ছু'জনের এক এ্যাড্‌ভান্স-পার্টি পাঠিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেললেন। সম্পদ থাকলে দোরগোড়ায় এসে বাঘ সেধে নিজের চোখ দিয়ে যায়।

রিপোর্ট পাওয়া গেল, এস্তেজাম একদম পাকা। থাকার তেমন অসুবিধে নেই। গোটা তিনেক কামরা দরকার। ছুই মেয়ে এক কামরায়। দম্পতির আর এক। তিন নম্বর রুম প্রয়োজন ছেলের জন্যে। পাশাপাশি চার চালার ছুটো ঘর। সব মিলে ছ'-সাত কামরা ত পুরাকাল থেকে মজুদ। বহুদিন একদম নিছক ছুটি ভোগ করেননি সরকার সাহেব। এবার নিজের জন্মভূমি, বাল্যভূমি—তা কেন, কৈশোর-ভূমিও তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল। বয়সের ধর্মই বলতে হয়। সাধেরও ত সীমা আছে। তা পূর্ণ হয়ে গেলে পরিতৃপ্তির ঢেকুর ওঠে। তখন ভবিষ্যতের হিসেব আর কেউ করে না। এরকম আত্মস্থ প্রশান্তি নিয়েই মানুষ বড় সুখ পায়।

সত্তর-পার বয়সে মিরাজ সাহেবের তেমনিই পর্যায়ে পৌছানোর কথা। পাঁচ দিন জন্মভূমি সাগরপুরের কোলে তাঁকে কাটিয়ে আসতেই হবে। ম্যানেজার আছে একজন ফার্মে। তার সহকারী আরো তিনজন। সকলেই বিশ্বস্ত, রিলায়েবেল দক্ষ কর্মচারী। অতএব ঝামেলা তেমন কিছু নেই।

সরকার সাহেবের মনে অস্বোয়াস্তি এক ধরনের ছেয়ে আসে। সাগরপুর শেষ কবে গিয়েছিলেন, আজ মনেও নেই। মিসেস হাজেরা সরকারের মনে আছে। গাঁয়েই তো ওদের বিয়ে, সাগরপুর থেকে এসেছিলেন বোরখায় শুধু বদন নয় প্রায় গোটা শরীর ঢেকে। নব বধূর বেশ ভেতরে। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। আর শ্বশুর বাড়ি কখনও যাননি। এখন গাঁয়েও বেপর্দা চলাফেরা তেমন আয়েবের ব্যাপার নয়। গা-সওয়া হয়ে গেছে। কেউ কটুবাক্য ব'লে পর্দাহীনা কি তাদের অভিভাবকদের নেইজ্জত করবে না। খুব জোর পেছনে বদনাম করবে অথবা আখেরী জমানার উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবে। হাজেরা সরকার তা শুনেছেন। তাই সাগরপুরে ফেরার কৌতুহল তারও কম নয়। পরিবর্তনের স্বাদ তিনিও চাখতে বড় আগ্রহী। তা না হলে, এইসব কলেজে পড়া মেয়েদের আবার বোরখার ভেতর ঢোকানো যেত, না তাদের রাজি করাতে পারত কেউ?

হাজেরা বেগম ভেতরে-ভেতরে অশেষ পুলকিত হয়ে উঠলেন। তিনি মনে

করেন, সব নসীবের খেলা। নচেৎ যে-চৌহদ্দির ভেতর সারা জনম বন্দী কেটে যাওয়ার কথা সেখানে আর উঁকি মারার সুযোগও রইল না।

বহুদিন পরে আবার সুযোগ এসেছে। উত্তেজনা স্বাভাবিক। ছোট ছেলে রমিজ শহরের জীবনেও এক রকমের এক ঘেয়েমি-জাত ক্লান্তি অনুভব করছিল। সব যান্ত্রিক হয়ে যায়, যদি মন সেখানে না বসে। ক্লাব, আড্ডা, তাস অথবা মোটর নিয়ে অকারণ স্পীড বাড়িয়ে শহরের ভেতর বা বাইরে দৌড়ানো —এসবের উত্তেজনাও ক্রমশ নিভে আসে। তখন স্বাদ বদলানোর প্রশ্ন ওঠে। রমিজ সরকার—ড্রাইভাররা যাকে ছোট সাব বলে—হঠাৎ পিতৃদেবের ইচ্ছাপূরণে নচেৎ এত উৎসাহ দেখাবে কেন?

অবিশ্যি ঝঞ্ঝাট কম নয়। বেডিং, মশারি এবং দৈনন্দিনতার আরো ছোট-খাটো বহু লট-বহর সঙ্গে নিতে হয়। পাঁচ দিনের ব্যাপার কুল্লে। তবু লটবহর ছাড়া চলে না। সরকার সাহেব ত ব্যবসা উপলক্ষ্যে পৃথিবীর দুই গোলার্ধ চষে বেড়িয়েছেন বছরের পর বছর। সেখানে লটবহর লাগে না। অবিশ্যি বিরক্তির বোঝা কিছুই তা-কে বইতে হবে না। বোঝা বইবে আর কেউ। আপিসের পিয়ন, আরদালী অগয়রহ। হুকুম তামিলের লোক ত কম নেই। প্রয়োজন হলে ঠিকা দু'চার জন নেয়া যেতে পারে। নিতেই হলো আরো বাইরের দু'জন হুকুম-বরদার এক হপ্তার বেতনে। আপিস থেকে একজন পুরানো বিশ্বস্ত আরদালী শুধু পাওয়া গেল।

দুই মেয়ে, ছেলে, নিজেরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পাঁচজন। সঙ্গে সাহায্যকারী আরো তিনজন। আটজনের পার্টি। যে-ভাইটি—নিকটআত্মীয়—গ্রামে থাকে, সে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, লোক তো বেশি নয়, কাজেই রান্নার জন্যে কোনো চিন্তা নেই। আর সাবেক আমলের বৈঠকখানা আছে। বিরাটিনের আটচালা। সেখানে তিরিশ জনের ঢালাও বিছানা স্বচ্ছন্দে পাতা যায়। সাবেক দহলিজ। মিরাজ সাহেবের অতীত দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। গাঁয়ের মকতব বসত এই বৈঠকখানায়। তার হাতেখড়ি তো সেইখানে। তবে বছর-বছর মেরামতের অভাবে জায়গাটার কি দশা, তা জানেন না তিনি। যতোই খুতখুতানি থাক, মামলা তো পাঁচদিন কি ছ'দিনের। সুতরাং তা নিয়ে অস্বোয়াস্তি বাড়িয়ে

কোন ফায়দা নেই। সরকার সাহেব মাঝে-মাঝে ভেবেছেন খামখা এ ফ্যাসাদে না গেলেও পারতেন। কিন্তু আর পেছানোর জো নেই। ছেলে-মেয়ে বেগম সাহেবা ত এখনই মনে মনে সাগরপুর পৌঁছে গেছে। এখন আল্লাহর উপর ওপর ভরসা। অবিশ্যি ছেলে-মেয়েদের তিনি বলে দিলেন, 'তোমাদের যা-যা লাগে পাঁচ-ছ' দিনের মতো নিয়ে নাও'। তারা হিশেবে ভুল করেনি। হাল জমানায় টিনের ভেতর সবই পাওয়া যায়। বিস্কুট আলু-চিপস, পনির মাখন, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি। নাজনী কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে একদম দেশী নাস্তার বন্দোবস্ত করবে, আগে থেকে জানিয়ে দিল। ভাইবোনে বচসা লেগে গিয়েছিল। রফা হলো, অকুস্থলে কে কি করে, তখন দেখা যাবে। খাবার বাড়তি সঙ্গে থাকলে ত কোন ক্ষতি নেই। উত্তম যুক্তি। বচসা থেমে গিয়েছিল অতএব।

হাজেরা বেগমও এক ধন্দে পড়েছিলেন। তার রুচি অর্থাৎ আহারের রুচি কম বদলে যায়নি। ক্ষিধে লাগলে পাকস্থলীর ভেতর সবই তোফা। কিন্তু চল্লিশ বছরের ব্যবধান। বাড়িতে সেই কবে ফ্রিজ এসেছিল, মনে থাকার কথা নয়। ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার অভ্যেস তখন থেকেই। কোথাও গিয়ে শীতল জল না পেলে প্রাণ ভরে না। হাজেরা বেগমের জন্যে সুতরাং সমস্যা। তবে তিনি সমস্যা মিটিয়ে ফেললেন মনে মনে। পথে ঈশ্বরদীর কুঁজো, সোরাই একটা কিনে নিলেই চলবে। পানি যদি একদিন রেখে পরদিন খাওয়া যায়, ফ্রিজের মতো হবে না। তবে ঠাণ্ডা হবে বৈকি। অবিশ্যি বাসি পানী। তা হোক। সব রকম বায়না কী দুনিয়ায় মেটে? প্রৌঢ়া বেগম সাহেবা এমন দার্শনিক, সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন। একবার রাওয়ালপিণ্ডি শহরে ব্যবসা উপলক্ষ্যে মিটিং ছিল। কর্তা তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। মারী পাহাড়ে গরমের দিনেও কী ঠাণ্ডা। সেখানে ফ্রিজ ছিল না। তাই বলে ঠাণ্ডা পানির অভাব হয়নি। সাগরপুরে তা আশা করা যায় না।

এক কথায় বলা চলে, আসন্ন সফর প্রত্যেকের কাছে তাদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। ঠাঁই নাড়া হতে গেলে এসব অবধারিত ঘটনা। নিজের চিরাচরিত জায়গার ভেতরও কোনো অস্বোরাস্তি থাকতে পারে। কিন্তু তা গা সওয়া হয়ে যায়। তার সংখ্যা বাড়াতে কারো মন সায় দেয় না। কুতী মানুষ মিরাজ সরকার। কুতিত্বের আর এক নাম

ফুটানি। কারণ, তাছাড়া ফুটানি দেখানো চলে না। খবরের কাগজে মিরাজ সাহেবের ছবি ছাপা হয়। তিনি শহরে গণ্যমান্য জন। কৃতিত্ব দেখাতে তার সাগরপুরে যেতে হবে কেন, যেখানে পৌছানোও সময়ের অঢেল অপচয়? গরীব জনপদ এলাকার কৃতিত্বের মহিমা বুঝার লোকজন কোথায়? মণি যাচাইয়ের জন্য মণিকার প্রয়োজন হয়। এইসব হিশে-বের বাইরেই সফরের প্রস্তাব যেন কল্পনায় ভেসে উঠেছিল। তাছাড়া অন্য ব্যাখ্যা অমূলক।

সে যাই হোক ছেলেমেয়েরা সাগরপুর পৌছতে না পৌছতেই পিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কোচের বদলে নিজেদের দুটো ল্যাণ্ড-রোভার গাড়ি। তারপর ট্রেন থেকে নেমে দুটো গ্রীণ বোটে, আগে থেকে বন্দোবস্ত করা ছিল। খুব চওড়া নয় এই নদী। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, শরতের প্রারম্ভ। মাঠের বিস্তার, আকাশের বেবহা নীল এবং বাতাসের আমেজ, নদী-পথের আঁকাবাঁক এবং তীরবর্তী জীবন-ধারার ছবি নাজনী, রাজনী, ব্রনিজকে বেশ মোহমুগ্ধ রেখেছিল। তিনজনের মধ্যে প্রগলভতা বেড়ে যায়। নাজনী হঠাৎ একটা ভাটিয়ালী গান গাইতে লাগল। সংলাপে ছেদ পড়ে। কখনও গানে ছেদ পড়ে। অবকাশ যাপনের এমন উপায় আছে, জায়গা আছে ওদের কাছে যেন প্রথম আবিষ্কার। গাঁয়ের ভেতর পথে রিকশা-চড়া ত আরো এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শহরে ওই গাড়ি তারাও চড়ে, বাড়িতে তিনখানা মটর থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু দু'পাশে এমন ভূমি শহরে কে সাজিয়ে দেবে? রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায় না শুধু সড়ক -সংলগ্ন ভিটার উপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে পাড়ার ঘোমটা-টানা বউ।

মিরাজ সরকারের পায়ের ধুলো এই এলাকায় পড়েনি বহু বছর। কিন্তু সে এই অঞ্চলের ছেলে, বিরাট ধনী। তাঁর কৃতিত্বের গৌরব এলাকার সকলে অনুভব করে। এই সফরের সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত আট দশ দিন আগে থেকে। ভিটার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বহু পর্দানশীনা বধূ দেখছে দুই তরুণীর রিক্‌শা-বিহার। বেগম সাহেবা প্রৌঢ়া মানুষ। সেদিকে তাকানোর কিছু নেই। কিন্তু তিনি এই এলাকার বউ। এই পরিচয় দিতে কে না গর্ববোধ করবে? কৌতূহল এই জন্যে আরো বেশি। তারপর আগে-পিছে করে দশ-বারোখানা রিকশার মিছিল। তা-ও দেখার মতো কৈকি। মানুষ আর মালে বোঝাই গাড়ি। মিরাজ

সরকার বৃদ্ধ। ডাকসেটে নাম। কিন্তু মানুষটিকে ত অনেকে দেখেনি। তাই বুড়ো দেখার সাধ কী কম? কিন্তু নদী-বক্ষের স্বাধীনতা নাজ্‌নী-রাজ্‌নী সড়কের উপর হারিয়ে ফেলে। এখানে গান ধরা চলে না। চারিদিকে ফোকাসের মধ্যে তাদের প্রতিচ্ছায়া আটক। অস্বোয়াস্তি লাগে। কেউ চেয়ে আছে বলে নয়, এমই এক জড়তা এসে গেছে পল্লী এলাকায়। শহরের সাজগোজ ও অপরের চোখে পড়ার জন্যে। এখানে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে পড়তে পারলেই যেন বরং প্রচুর আরাম।

রমিজ গ্রীন বোটে খই ফুটাচ্ছিল এমন সফরে পিতার অবদান এবং প্রস্তাব-মাহাত্ম্য নিয়ে। রিক্‌শায় সে চুপ। তবে তার চোখ সবই আত্ম-সাৎ করছিল। ক্যামেরা ফিল্ম স্যুটকেসে রয়ে গেছে। সেই স্যুটকেস অন্য এক রিক্‌শায়। তাই রমিজের বড় আফসোস। মনে-মনে প্ল্যান করে ফেললে, ফেরার পথে সে পুষিয়ে নেবে। অন্তত এমন ভুল করবে না। সরকার সাহেবকে মাঝে-মাঝে রিক্‌শা থেকে হাত তুলতে হয় সালামের জবাব দিতে। কারণ, তাকে দেখে বহু জায়গায় অনেকের হাত সম্ভ্রমে উপরে উঠে যায়। হাজেরা বেগম আছেন আলাদা এক রিক্‌-শায়। বহুদিন উঁচু-নিচু এমন রাস্তায়, এমন যানবাহনে চলাফেরা তার অভ্যেস নেই। বাতের সেকায়েৎ শুরু হয়েছে চল্লিশের পরে। কাজেই রিক্‌শা-বিহার তার কাছে খুব আরামপ্রদ ছিল না। কিন্তু মনে-মনে তিনি আল্লার শোকর-গুজারি করছিলেন নিজের সামাজিক অব-স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। সবই করুণাময়ের মর্জি।

রমিজের মনে হলো, গাড়ির ভেতর থাকলে তারা তিন ভাই-বোনে কোরাস ধরত, রিকশার গতি মন্থর, তার ওপর খোলা এবং এত বেগানা চক্ষুর সীমানার ভেতর,গলা খুলতেই লজ্জা ঘিরে ধরে। রিক্‌শায় এক ঘণ্টার বেশি যায়। কখনও পাড়ার ভেতর, কখনও ছোট-খাটো চষা মাঠ, পুকুর, দীঘি, জংলা ঝোপঝাড়, হাটের দিন ছিল তাই ঝাঁকা মাথায় পসারীর দল অথবা হাট-ফেরৎ গ্রামের মানুষ—ছবি-ছবি-ছবি। ছবির কি শেষ আছে? এই এক অনন্ত রীল নিজেকে উন্মোচিত করে চলেছে। রমিজ অবাক হয়ে যায়। শহরের দৃশ্য সদা-চলমান। স্পীডের জন্যে কি তা মনে এমন দাগ কাটে না? নিস্তরঙ্গতাও তরঙ্গ হতে পারে সরকার-নন্দন জানে না। পরিবর্তনের ঢেউয়ে সে বেশ মৌতাত পায়। নাজনী,

রাজনীর জন্যে ত আর এক জগৎ আবিষ্কার। দু'জনে এক রিকশায় বসে এক অপরের গায়ে ফাঁক বুঝে মৃদু চিমটি কাটছিল। সামান্য বয়সের ব্যবধান। ওরা দু'জনে প্রায় সখীর মতো। ঠিক সহোদরা নয়। নিজেদের গোপন কথা অপরকে স্বচ্ছন্দে জানায়। পেছনে বিশ্বাসের ভিত: আর কারো কাছে তা পাচার হবে না। সরকার সাহেব নিজের অতীতে সাঁতার কাটেন। এইসব পথ-ঘাট এক কালে তার খুবই চেনা ছিল। তখন রিক্শা ছিল না। গোটা পথ হাঁটতে হতো। শহরে যাতায়াত তখন বেশ পরিশ্রম-সাধ্য ব্যাপার ছিল। বর্তমানে সময় যায়, কিন্তু শরীর আরাম পায়। মিরাজ সরকার নিজেই প্রস্তাবক। কিন্তু কেন এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ঠিক ঠাহর করে পারেন না। ছেলেমেয়েদের টানে তিনি ভেসে চলেছেন। কিন্তু তাদের আনন্দ-স্রোত তাঁর গায়ে লেগেছে, মনে হয় না। তিনি চারপাশে চেয়ে দেখেন। খোলা চোখ কিন্তু মাঝে-মাঝে বুঁজে আসে। নিশ্চয় ক্লান্তি। কারণ, এমন সফরের সঙ্গে তিনি বহুদিন পরিচিত নন। বৃদ্ধকালে শারীরিক দুর্ভোগ থাকলে পরিবেশ অনাত্মীয় হয়ে যায়। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় রিকশা চড়া আদৌ আরামদায়ক নয়। সোয়া ঘণ্টার মতো লাগল সেদিন নদীর ঘাট থেকে সাগরপুর পৌঁছতে। মোবারক মিয়া কাজের লোক। এন্তেজাম ভালোই করেছিল। সবই ত নির্দেশনা মোতাবেক। তার কাজ শুধু গুছিয়ে-গাছিয়ে নেয়া।

দুপুরের রান্না করাই ছিল। শহরের মতো আলাদা খাবার ঘর মেলেনি। তবে পুরানো একটা টেবিলের ওপর সব সাজিয়ে দেয়া। নাজনী এমন এন্তেজামের বিরোধী। মাদুর পেতে নিচে বসে খেলেই চলত। এ ত শহরের 'বুফে' খানা হয়ে গেল তাহলে আর গাঁয়ে আসার কী প্রয়োজন ছিল?

মোবারক মিয়ার বয়স কম নয়। পঞ্চাশ-শঞ্চান্ন হবে। হুশিয়ার বুদ্ধিমান মানুষ। নাজনীর পাল থেকে সে বাতাস কেড়ে নিল, 'মা, আহার লাগে বাঁচার জন্যে। সেখানে অভ্যেস, একটা বড় কথা। আমি ভাবলাম, তোমাদের মাটির ওপর বসে খাওয়ার অভ্যেস নেই, তাই এমন ব্যবস্থা। ভাই সাহেব আর তোমাদের যে আমাদের মাঝখানে পেয়েছি—সেই বড় সৌভাগ্য। অসুবিধা হলে কিছু মনে কর না, মা।'

নাজ্‌নী তা-কে অভয় দিল, 'আপনি বিব্রত হবেন না, চাচা। আমাদের মেহমান মনে করবেন না।' খাদ ছিল না কোথাও কথা-গুলোর মধ্যে। আহারে কারো মন বসেনি। একটু জিরিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওই ভাইবোনদের পেয়ে বসেছিল। অবিশ্যি টেবিলে ডিস অবহেলার পর্যায়ে পড়ে না। রুই মাছ, মুরগী, দু'-রকম ভাজা,ঘন ডাল, তার ওপর তিন-চার রকমের ভর্তা। মোবারক মিয়ার স্ত্রী রান্নাবান্না ভালই জানে। গাঁয়ের খান্দানি মেয়ে। এখন পড়তির দশায় উপাচার জোটে না। নচেৎ রান্নার ইলেমে সে সিদ্ধহস্ত। পাড়ার দু'তিনজন বিধবা মেয়ে বর্তমানে তার সহকারী। আগে থেকে বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং আহারের খুঁত বের করা কঠিন।

বিকেল হওয়ার আগেই দুই বোন গাঁয়ের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। মোবারক মিয়া একজন আরদালীকে সংগে যেতে বলল। অবিশ্যি তার দরকার ছিল না। যদিও গাঁয়ে মেয়েরা পর্দানশীন, তবে বেপর্দা হাঁটাও নিরাপদ। অন্তত গুণ্ডা-বদমাসের ভয় নেই। রমিজ ত কোথায়-কোথায় না ডুব দিয়ে রইল মোবারক মিয়ার এক কিশোর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এবার ক্যামেরা গলায় ঝোলাতে সে ভোলেনি। অবিশ্যি বিকেলের চা খেতে ভুলে গেল। মিরাজ সাহেবের দহলিজ ছাড়ার উপায় ছিল না। একের পর এক মানুষ জমতে লাগল। তাকে দেখার জন্যেই অনেকে হন্যে ছিল। এই এলাকার বিশিষ্ট সন্তান। এত নাম-ডাক। এমন মানুষকে একবার চোখে দেখতে পারলেই ত জীবন সার্থক হয়ে যায়। অনেকে এল বাপের পরিচয় দিয়ে, যে-বাপ বর্তমানে মৃত এবং একদা মিরাজ সরকারের বাল্যসঙ্গী ছিল। সরকারের সমবয়সী মাত্র দু'জন জীবিত। একজন শয্যাশায়ী। অন্যজন এসে দেখা করে গেল, তারও বয়স তিয়াত্তরের মত। চোখে কোনোরকমে দেখেন। ছেলেদের গলগ্রহ— কোন রকমে প্রাণ ধারণ করে আছেন। তিনি আদিখ্যেতা করে গেলেন, "মিরাজ, তুমি আমাদের অহঙ্কার। তোমার মত গাঁয়ের সোনার পিদিম যদি এদিকে জ্বলত, তা হলে কী এত দুর্দশা হয় আমাদের। নসীব, তোমার সঙ্গে মওতের আগে অন্তত সাক্ষাৎ ঘটল।'

এই সঙ্গীর কাছ থেকেই অনেক পুরোনো সঙ্গীতের সংবাদ পাওয়া গেল। সংবাদ নয় ত দুঃসংবাদ। কায়ক্লেশে কোনো রকমে আছে তারা। সরকার

বংশ প্রায় ধ্বংস। সঙ্গী মিয়াজের বুদ্ধিমত্তার তারিফ করল। জমি আঁকড়ে জমির আয়ের ওপর নির্ভর না করে সে যে বেরিয়ে গিয়েছিল, খুবই আক্কলমন্দের কাজ করেছে। আত্মীয় স্বজনরা সবই দুর্দশাগ্রস্ত।

বহুকাল পরে এক চাচাতো বোনের খবরও পাওয়া গেল। হেলেনা বেশ সুন্দরী হয়ে জন্মেছিল। তারই সম-বয়সী। বিয়ে হয়ে গেল পাশের গ্রামে। তার মুখচ্ছবি বহুদিন নিজের বিয়ের পরও সরকার সাহেব ধ্যান করতেন। সেই হেলেনা দুঃখের পসরা বয়ে-বয়ে বর্তমানে একদম উন্মাদিনী। জালেম স্বামী অপঘাতে মারা যায়, তারপর জওয়ান দুই ছেলে। বিষয়-আশয় শরীকরা বিধবা এবং অসহায় পেয়ে মেরে দিলে। পাগলী এখন ঘুরে বেড়ায় পথে-পথে। এক ছেলের বিধবা বউ আছে। সে মাঝে-মাঝে শাশুড়ীর খোঁজ যত্নআত্যি করে। কিন্তু পাগলীর ত ঠাঁই-ঠিকানা নেই। দু'মাস তিনমাস উধাও। আবার হঠাৎ হাজির হয়। সরকার বংশের এক মেয়ের এই হাল। সাগরপুরে সে মাঝে-মাঝে ছিটকে পড়ে। রাস্তায় গান করে। কখনও হাসে, কখনও কবরস্থানে গিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। পাগলীর কাণ্ড। চেনাশোনা কারো বাড়ি গিয়ে কখনও ভাত চায়। সব লোককে চিনতে পারে না আর।

'তোমার আসার খবর ত আজ ক'দিন থেকে শুনছি। হেলেনা পাগলী এসেও যেতে পারে। ঠিক নেই কিছু। আহার নেই বিশ্রাম নেই। তাজ্জব, এতদিন বেঁচে আছে কিভাবে? কি চেহরা ছিল। সেই ধলা চেহরা এখন কালা। কিন্তু তাজ্জব মিরাজ, এখনও এমনই শরীরের বাঁধন, মনে হবে না, বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। আর মুখ দেখে মনে হয় না ও পাগলী। চোখে স্বাভাবিক চাউনী। কিন্তু হঠাৎ কথা, হঠাৎ গান অথবা হঠাৎ ধেই-ধেই নাচ দেখার পর তুমি বুঝতে পারবে, হেলেনা বদ্ধ পাগলী।'

সংগী রিপোর্ট দিল। মিরাজ সরকার অতীতে সাঁতার কাটতে পারেন না। একের পর এক সাক্ষাৎপ্রার্থী আসে। শুধু কী নিজের গাঁয়ের? পাশের গাঁ থেকে লোক খবর পেয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থী ততটা নয় যতটা দর্শনপ্রার্থী। অন্দরে ঠিক একই কাণ্ড হাজেরা বেগমকে ঘিরে। শাশুড়ী সম্পর্কীয় মুরুব্বী একজন এখনও বেঁচে আছেন। খুব জয়ীফ, আশির বেশি বয়স। লাঠির ওপর ভর দিয়ে কোন রকমে এসেছেন। এখন ভিটে

আলাদা হয়ে গেছে মামলার জ্বালায়। নচেৎ এক কালে একই ভিটায় পাশাপাশি সব জ্ঞাতি সরকার-রা বসবাস করত। হাজেরা বেগম যেদিন বধূবেশে এই বাড়িতে এসেছিলেন সেদিনের কাহিনী এখনও বৃদ্ধার মনে আছে। কত বছর, কত কালের ঘটনা। তা কী এত সহজে শেষ হয়। বৃদ্ধার এক সন্তান গঞ্জেই দোকান করে কোন রকমে সংসার চালায়। 'ওকে কতবার কইছি, তোর মিরাজ ভায়ের কাছে একবার গিয়া ক' আমার কথা। হে আমার কথা কানে লয় না, মা।' পরিবেশ আর উৎফুল্ল হয় না। একই ধারার রঙ। পৃথিবীতে এত রকমের দুঃখ আছে তা খবরের কাগজ পড়ে বুঝা যায় না, সরেজমিন হোঁচট না খেলে।

রাত্রে সবাই বিদায় নিলে, বরং হাজেরা বেগম কিছু হাঁফ ছাড়তে পারেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তারও ত বয়স কম নয়। তেবট্টি-চৌষট্টি ত হবেই। একান্ত থাকা অভ্যেস। ছেলেমেয়েরা জওয়ান। মা'র সারা-ক্ষণের সঙ্গী-সাথী নয়। কর্তা এখনও রোজগারের ধান্দায় থাকেন। ভিড় তার আর ভাল লাগে না। বাড়িতে মাঝে-মাঝে পার্টি হয়। তখন অবিশ্যি তিনি যোগদান করেন। কিন্তু বেশিক্ষণ আনন্দ পান না। তারপর ভিড়ের ভেতর নিরানন্দ কালক্ষেপ। কয়েক ঘণ্টার ভেতর অনেক খবর পেলেন তিনি। চেনা শোনা মেয়ে সমবয়সী যারা ছিল তারা ত বিয়েশাদীর পর ভিন গাঁয়ে কোথাও চলে গেছে। মুরুব্বীদের ভেতর একজন জীবিত। ফলে, অচেনাদের মধ্যে এখন বিচরণ। পার্টির ভেতর কতো পরিচয় ঘটে। সে ত পাঁচ মিনিটেই ভুলে যেতে হয়। দু'একজন শুধু মনে দাগ কেটে থাকে। সেইজন্যে ভাল না লাগলেও অমন জৌলুষ নিষ্প্রভ হয়ে যায় না।

মেয়ে দু'জন রাত্রে খাবারের অর্ডার বড় সজীব সপ্রতিভ, গ্রাম-সফরের রিপোর্ট দিতে লাগল। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে ছিল রমিজ সরকার। বিজিনেস প্রশাসনে তার ডিগ্রী শুধু বাবার পরামর্শে তাকে খুশি রাখার জন্যে। নচেৎ রোমান্টিক নায়ক হতেই পারলেই সে খুশি। শরাবের আসরে বন্ধুরা তাকে 'হিরো' বলে সম্বোধন করে না খামখা। সাগরপুর না এলে তার জীবনে অপূর্ণতার সংখ্যা আরো বেড়ে যেত—এমনই তার ভাবসাব। মিরাজ সরকার সাহেব খুব খুশি ছেলে-মেয়েদের এত

আনন্দ দিতে পেরেছেন। তাঁর নিজকে কিন্তু যেন বেকুব ঠেকছিল। এখন হেঁটে হেঁটে এ-বাড়ি-সেবাড়ি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। লোক আসতেই থাকবে বৈঠকখানায়। তিনি তো শুধু এই গ্রামের ছেলে নন। আশপাশের গ্রামেও তাঁকে দাবি করে। সরকার সাহেবের মন মুষড়ে যায়। এই জড়-ভরত, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকার জন্যে কী তিনি সাগরপুর এসেছিলেন? ছেলে-মেয়েদের উত্তেজনায় অবিশ্যি তিনি উদ্দীপিত, যদি উত্তেজিত নাও হন।

প্রাচীন কেতার বাড়ী। অন্দরের পেছনে পেশাব-পায়খানার বন্দোবস্ত সামান্য দূরে উঠানে। অবিশ্যি প্রাচীরের মধ্যে। রাত-বিরেত ভ'য়ের কিছু নেই। বৈঠকখানায় গ্রামের দু'জনকে পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন মোবারক মিয়া। এ্যাটাচড বাথরুমে অভ্যস্ত নাগরিক সকলে। কিন্তু কারো কোনো অভিযোগ নেই। নাজনী মেঘের উপর দিয়ে হাঁটছিল অহেতুক স্ফূর্তিতে তার মন বোঝাই। রাজনীর সঙ্গে তার আড়ি আর মাখামাখি সমান্তরাল জড়িত। দু'জনে এক কামরার অধিবাসী। শহর থেকেই গ্যাস ল্যাম্প এবং হ্যাজাক বাতি আনা হয়েছিল। যেন বিজলীর অভাব কেউ না, বোধ করে। শুতে যাওয়ার আগে নাজনীর ব্রা'র ষ্ট্র্যাপে পেছনে কি যেন গণ্ডগোল তাই অগ্রজার—যাকে সে আপাই সম্বোধন করে—সাহায্য চাইলে। 'আপা, ছাখতো খুলছে না কেন?'

—তুই কেন যে এ-সব বাঁধিস খামখা।

—কেন? হয়েছে কি?

—খামখা এই হাংগামা। ব্র্যা'র ডেফিনেশন (সংজ্ঞা) জানিস?

—কি?

—যার দ্বারা তিল-কে তাল ও তাল-কে তিল করা যায়—তাহাকে—?

—ব্রা বলে।

—ঠিক বলেছিস। তবে তোর কী দরকার?

—তোমার তাল হলো কী করে?

—হাত লেগে-লেগে। তোর কী খবর?

—হাত লাগব-লাগব করছে। আরে যাঃ, আমার পিঠের দিকে জলদি এসো।

দু'জনেই পরস্পরের পিঠে কৃত্রিম কিল চালায়। তারপর অনেক রাত

পর্যন্ত গপ্‌প করে। খুব ভোরে উঠেই গাঁয়ের বাতাস খাওয়ার প্ল্যান উভয়ের। সখীসুলভ নৈকট্যে দুই জনে ডগমগ।

রমিজ ত মোবারক মিয়ার কিশোর এবং গাঁয়ের আরো দু'টি ছেলেকে নিয়ে খুব সকাল থেকে উধাও হয়ে গেল। দুপুরে খেতে এল না। বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল সে। নিরাপত্তার জন্যে বাড়ির দু'খানা বন্দুকই মিরাজ সাহেব সঙ্গে নিয়েছিলেন। রমিজ ব্যাগের ভেতর রসদ নিতে ভুলেনি। টিনের মাছ, বিস্কুট, বাখরখানি, মাখন ইত্যাদি। দু'টো ফ্লাস্ক বোঝাই পানি। প্রয়োজন হলে পথে টিউবওয়েল থেকে আবার নেয়া যাবে। রমিজ ফিরল সন্ধ্যার সামান্য আগে। অবিশ্যি শিকার সে পায়নি। নদীর চরে হাঁস শিকারের বাসনা ছিল। কিন্তু সুযোগ মেলেনি। তবে ঘুরেছে সে। কখনও নৌকায়, কখনও পায়ে হেঁটে। আবার মাঝে মাঝে গাছের তলায় বিশ্রাম, আহার। সঙ্গী গাঁয়ের তিনটি ছেলেই খুব মজা পাচ্ছিল, অভুক্ত ছিল না কেউ। তার ওপর মজার-মজার খাবার। টিনের ভেতর সার্ডিন মাছ। রান্না-করা। তাদের ত অবাক হওয়ার এমন সুযোগ জীবনেও মিলবে না। চরে পাখির পেছন-পেছন নৌকায় সফরে অবিশ্যি বেশি সময় কেটে যায়। রমিজ নৌকা ভাড়া করেছিল। মাঝিদের সে সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করেছে। তারা খুব খুশি। ভাড়াও আশাতীত পেয়েছিল প্রত্যেকে। রমিজ বাড়ি ফিরল। বেজায় হাল্লাক।

মোবারক মিয়া প্রায় অন্তর্যামীর মত। কার কি দরকার আগে থেকেই জানে। রমিজের গোসলের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। উঠানের কোণে পুরোনো পরিত্যক্ত এক রান্নাঘরই বর্তমানে বাথরুম। বাথরুম সত্যিই গোসলখানা। সঙ্গে পেশাব-পায়খানার বন্দোবস্ত নেই। তার জায়গা আলাদা। স্নান, নাস্তা শেষে রমিজ আবার ফ্রেশ, বোনেদের কামরায় গিয়ে গুলতানি জুড়ল। সকাল থেকে তারাও কম ব্যস্ত ছিল না। গ্রামের অন্য পাড়ায় গেছে। দু'চার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অভিজ্ঞতার ঝুলি নানা বৈচিত্র্যে ঠাসা। সারাদিন টইটই ভবঘুরে রমিজ এবার কিছু সময়-ক্ষেপের কথা ভাবে। বোনেদের সঙ্গ ভালো লাগে না, তবু বসে থাকে এবং কথায় যোগ দেয়।

রমিজ বললে, 'এবার আমি শহরে গিয়ে বিদেশী এম্বেসি (দূতাবাস)-গুলোকে একটা সাজেশন (প্রস্তাব) দেব।'

দুই কৌতূহলী বোন একসংগে উচ্চারণ করে, 'কী ভাইয়া?'

—মফস্বলে বিশেষ-বিশেষ জায়গায় ওদের ব্রাঞ্চ (শাখা) থাকা উচিত।

—কেন?

—ওরা শাখা খুললে সব রকম বন্দোবস্ত থাকবে। স্থানীয় লোকদের কিছু বলার থাকবে না। তাদের দেখাদেখি সিভিলাইজ্‌ড (সভ্য) হয়ে উঠবে আশেপাশের লোক আর ডিপ্লোমেসিতে কাজে লাগবে।

এই সময় রাজ্‌নী, নাজ্‌নী দু'জনে হি-হি হাসতে লাগল। সহজে থামতে চায় না। রমিজ শেষে ধমক দিয়ে বললে, 'তোদের হিষ্টেরিয়া হলো না-কি? হাসির কী হলো।'

মুখরা নাজ্‌নী জবাব দিলে, 'আমরা তোমার সাজেশনের মোটিভ (উদ্দেশ্য) ধরে ফেলেছি।'

—কী ধরেছিস?

—আমরা জানি।

বেট (বাজি ধরলাম), বল, কাম-অন।

—তোমার এত মেহনতের পর ড্রিংকসের (শরাবের) অভাব ঘটছে।

—না না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এম্বেসির ব্রাঞ্চ থাকলে এই মফস্বলে এমন অসুবিধা হতো না। তা আমাদের বুঝতে বাকি নেই।

রমিজ নিজের সাফাইয়ে জবাব দেয় 'আরে না। ক'টা দিনের জন্যে কী আসে যায়।'

—ক'টা দিন মানে। আব্বার হিশেবে পাঁচদিন। এক-আধ-দিন বাড়তেও পারে।

মন্তব্য করলে রাজনী।

রমিজ উত্তর দিলে সঙ্গে-সঙ্গে, 'দু-দিন হল। কালকের দিনটা কোনরকমে চলে যাবে। পরদিন আমি নেই।'

—আমি নেই মানে?

—আমি শহরে ফিরে যাব।

—সে কি। আব্বা কি ভাববে?

ছ' বোনে রায় দিলে।
রমিজ বেশ বিরক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলে, 'ধ্যুৎ, তোরা কী ভাবছিস? টু ডেজ এনাফ ফর দি ফাদার্স মাদারল্যাণ্ড (আব্বার জন্মভূমির জন্যে ছ'দিন যথেষ্ট)। আর জেয়ারত (দর্শন) করার মত এখানে কিছু নেই। কাল্‌কের দিনটা কোন রকমে কাটাতে হবে। তোদের কী মত?'

উভস্বরে ধ্বনিত হল 'ভাইয়া'

—ভাইয়া কী?

—তুমি আমাদের মনের কথা একদম টেনে বলেছো।

—আয়, আয় হাত মেলা। টু ডেজ এনাফ, এনাফ।

নাজনীর কণ্ঠে হতাশা। সে বলে, 'কিন্তু আব্বাকে কী বলা যাবে?'

'কিচ্ছু বলতে হবে না। কাল ওসব আমি ম্যানেজ করব। আম্মা কী বলেন কে জানে'।

রাজনী ভাইয়ের মুখ থেকে যেন কথা লুফে নিয়ে বললে, 'আম্মা, আম্মা খুব এনজয় (উপভোগ) করছে নাকি? তার সোরাই কেনা হয়নি, কলসের পানি ঠাণ্ডা নয়। আরদালীদের অন্তত ছ'দিন পাঁচ বার খোঁটা দিয়ে ধমকেছেন। এসব এন্‌জয়ের লক্ষণ নাকি?'

'তবে আব্বার কথা শুনে রাখ। তিয়াত্তর বছর বয়সেও আব্বা কেমন স্মার্ট (চটপটে)। এখানে কেমন স্থবির লোকজনদের সামনে। আমার মনে হয় উনিও খুব এনজয় করছেন না।'

রমিজের জবাবের পর রাজনী বললে, 'ভাইয়া, খোলাখুলি আমিও বলি: এই বাথরুম সমস্যা আমার সমস্যা। রাত্রে এখনও উঠতে হয়নি। অতো দূরে উঠান পেরোনো আমার কাছে কেয়ামত। তা ছাড়া।'—

'আর একটা দিন। আমি ঘুমোতে চললাম। খাওয়ার সময় তুলিস আমাকে, বলে রমিজ আসর ত্যাগ করল।'

পরদিন সকালে নাস্তার পর ঠিক হল, এই বাড়ির আঙিনায় গোটা ফ্যামিলির কিছু ফটো নেয়া যাক। প্রস্তাব রমিজের। ক্যামেরাম্যান অবিশ্যি সে। এই ফটো নেয়ার পর আরো কিছু ফটো তোলার ইরাদা তার।

আঙিনায় চেয়ার পাতা হল। খবরদারি রমিজের। কে কী ভাবে বসবে, পোজ পর্যন্ত তার প্রস্তাব-মত।

বেশ কয়েকটা গ্রুপ-ফটো নেয়া হোলো। রমিজও বাদ যায়নি। ক্যামেরা সব ঠিকঠাক করে সে মোবারক মিয়াকে শুধু কোথায় টিপ দিতে হবে নির্দেশ দিয়ে কাতারে শামিল হয়ে গিয়েছিল।

আরো কিছু ফটো নেয়া দরকায়। একসঙ্গে গোটা ফ্যামিলি নয়। বরং ভাঙা-ভাঙা শরীকানায়। কখনও দু' বোন একত্রে, অথবা বাবা বা মার সঙ্গে। ইত্যাদি-ইত্যাদি যোগ-বিয়োগ। এই সময় আঙিনায় এক প্রৌঢ়া মহিলা দেখা গেল। চুলে পাক ধরেছে তার। তবে মুখে বলিরেখা তেমন স্পষ্ট নয়। চুলে বহুদিন বিন্যাসের ছোঁয়া বা তেল পড়েনি। একটা রঙ-ছুট ময়লা শাড়ি শুধু তার পরণে। সবমিলে অস্বাভাবিক চেহারা।

তাকে দেখে সকলে থ'। মোবারক মিয়া কিছু বলার আগেই রমিজ সরকার তাকে চিনেছেন। দুই ডাগর চোখের চাউনি এখনও নিষ্প্রভ হয়নি। গৌর রঙ বিবর্ণ কালো হয়ে গেছে। কিন্তু বয়সের অনুপাতে কতো সজীব। মোবারক মিয়া মহিলাকে কিছু বলার জন্যে এগিয়ে যাওয়ার সময় মিরাজ সরকার দ্রুত তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান এবং বলেন, 'হেলেনা, আমাকে চিনতে পার?'

স্তব্ধ মহিলা। প্রশ্নকর্তার মুখের ওপর দু' চোখ ফেলে চেয়ে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। মিরাজ সরকার তখন দু' দিকে হাত তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য, মহিলার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, 'হেলেনা, তুমি আমাকে চিনতে পারো??' কিন্তু নিমেষে সংযত তিনি আবার যোগ করেন, 'হেলেনা, আমি মিরাজ। তোমার মিরু ভাই।' যে ডাকনাম পাঁচ দশকের বেশি আর কারো মুখে কখনও উচ্চারিত হয়নি, আজ আবার নিজেই উচ্চারণ করলেন নামের মালিক।

এবার হেলেনার চোখ অন্যান্য মুখের দিকে যায়। এক এক করে দেখে সে। কিন্তু তার মুখে এতটুকু শব্দ নেই।

সরকারের ছেলেমেয়ে, মোবারক মিয়া এবং ফটো তোলার তামাসা দেখার জন্যে উপস্থিত কয়েকজন—কারো মুখে শব্দ নেই। সকলে বিস্ময়ে থ'।

'আমি মিরু, হেলেনা বোন।' সরকারের গমগমে হুকুমদানী গলার আওয়াজ উচ্চতর হয়।

কিন্তু পাথর কি জবাব দিতে পারে কোন দিন? পাগলেরা আসলে পাথর।

একটু পরে পাথর নড়তে লাগল। হেলেনা পাগলী নাচতে শুরু করেছে। মিরাজ সরকার দাঁড়িয়েই থাকেন। অন্যান্য সকলে এই তামাসা উপভোগ করছিল। উন্মাদিনী হঠাৎ মুখ খোলে এবং শোনা যায়, যা নিতান্ত অর্থহীন: ডা—ডা—ডা—ড্ টু··টু ট্···হা···হা হহ· এই জাতীয় শব্দ। নৃত্য বন্ধ হয় না।

উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধ। এই আবহাওয়া নষ্ট করতে যেন কারো সাহস ছিল না।

এইভাবে ক' মিনিট কেটে গিয়েছিল, কেউ বলতে পারবে না।

হঠাৎ পাগলী হেলেনা নাচের ঘোরে তার কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে গেল সকলের সামনে।

মোবারক মিয়া চোখের ওপর আঙুল রেখে প্রথমে পাগলীর কাপড় নিয়ে তার দিকে এগোয় আর তাকে বলতে শোনা যায়, 'হেলেনা বুবু, তুমি এখন যাও। কাপড় পরো, কাপড় পরো। ছিঃ ছিঃ।'

আর যারা বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল, সকলেই অবনত মুখ।

একটু পরে একটানা তীব্র হাসির শব্দ শোনা গেল ভিটার আর এক কোণায়। পাগলী অকুস্থল থেকে সরে গেছে।

তখন উপস্থিত যে যার গন্তব্যে ফিরতে থাকে।

রাত্রে মিরাজ সরকারের প্রস্তাব শুনে তো মোবারক মিয়া হতবাক। শুধু শুধু সে উচ্চারণ করেছিল, 'ভাই সাহেব!' উচ্চারণ নয় আর্তনাদ।

ভাই সাহেব বললেন, 'মোবারক, আমার তো ইচ্ছে ছিল আরো দু'দিন থেকে যাই। আল্লা কখন তুলে নেন, বয়স হয়েছে। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছা নয়। ওরা শহরে মানুষ, গাঁ পছন্দ করবে কেন? ওদের দোষ নেই।'

'দূর গ্রামে আমাদের কিছু আত্মীয় আছে ওদের খবর দিয়েছি।' ম্রিয়মাণ স্বর মোবারক মিয়ার। 'ওদের বড় দেখার শখ আপনাকে।'

'ওদের শহরে পাঠিয়ে দিও, আমি কয়েক শ' টাকা রেখে যাব তোমার কাছে।' মিরাজ সরকার জ্ঞাতি ভাইকে নিরস্ত করেন।

মোবারক যখন ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে আর্তি-আবেদন পেশ করল, তখন রমিজ বললে, 'আব্বার প্রচুর কাজ। এক নাগাড় পাঁচদিন বাইরে থাকা অসম্ভব। মাকু ঠেলাঠেলি করছেন আব্বা, আমাদের ওপর দোষ চাপিয়ে।'

বেচারা মোবারক মিয়া। তার নিজের কিছু আর্জি আবেদন ছিল জ্ঞাতি

অগ্রজের কাছে, যা শহরে গিয়ে বলার মওকা মেলে না। এবার গাঁয়ের নিভৃতে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তা আর হলো না।
পরদিন সপরিবারে মিরাজ সাহেব নগরমুখী। ঘরে ফেরার আনন্দে কোন ঘাটতি পড়ে না।

ক্লাব থেকে ছোট সাহেব রমিজ তিন দিন গায়েব ছিল।
পরদিন সান্ধ্য আসরে বন্ধুবর্গ তার অভিজ্ঞতা জানার জন্যে কৌতূহলী। 'হিরো'র অভিজ্ঞতা তো। একজন জিজ্ঞেস করলে, 'কি রকম দেখলে তোমার আব্বাজানের জন্মভূমি?'
হুইস্কি-বোঝাই গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল রমিজ। হাসির চোটে সে বিষম খায় বেশ জবর রকমের।
হুইস্কির ঝাঁঝ চোখ কান নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে রমিজ জবাব দিলে, "জন্মভূমি ত নয়, দেখে এলাম তোমার আমার কর্মভূমি .. ।"
তারপর সে আবার বেদম খিকখিক হাসি হাসতে লাগল। সঙ্গীরা ভাবলে আজ অল্পেই ওর নেশা ধরেছে।
মোবারক মিয়া ভেবেছিল হেলেনা পাগলী সব ভণ্ডুল করে দিয়ে গেল।

কেপ্রাদে

ব্যাঙ্ক আমার দর্গা।

তীর্থে গেলে মানুষ গ্লানিমুক্ত হয়। মনের বেবাক প্রশান্তি ফিরে আসে। আমার তা-ই ঘটেছিল। যদি ব্যাঙ্কার-বন্ধু আমার না থাকত, হয়ত আর বাঁচতাম না। অথবা বেঁচে থাকতাম পাগল হয়ে, একই সঙ্গে ডবল জীবনের বোঝা বয়ে। আইসবার্গের মত কিছু ভাসা, মানে অল্প ই ভাসা। বাকী অগাধ পানির তলায়। কিন্তু পীর-পয়গম্বরের কৃপা, মুরুব্বীদের দোয়া এবং নসীবের খেলা-লেখা—ফাঁড়া কেটে গেল। বড় আকস্মিক ভাবে। সব কৃপা দোয়া ছাপিয়ে গেল ব্যাঙ্কের করুণা। তাই কোন ব্যাঙ্কের বিল্ডিং দেখলে বাইরে হাত না তুললেও আমি মনে মনে সালাম জানাই মাথা ঝুঁকিয়ে। আর যখন ব্যাঙ্কের পিয়ন থেকে প্রশাসকের সাক্ষাৎ পাই, মনে হয়, ফেরেস্তার দেখা পেলাম অথবা কোন পনর বছর নিরুদ্দেশ বন্ধুর, যার সঙ্গে সন্ধ্যায় একত্রে বসলে বিশ বছরের সাকী হুইস্কির বয়স এক শ' সাল ছাড়িয়ে যায়।

আপনারা ভাবতে পারেন, বোধ হয় আমি দেউলে হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ ব্যাঙ্ক এসে আমাকে টেনে তুললে। ঝুট বলব না। সত্যি আমি দেউলিয়ার খাতায় উঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা পয়সার নয়। খোয়ার শুধু অর্থের ক্ষেত্রেই ঘটে না, তা আপনারা জানেন। কাজেই টাকা পয়সার কথা একদম ফজুল, অপ্রাসঙ্গিক। আমার বাঁচা নীলামে উঠেছিল। কিন্তু নীলামে দাম উঠে বীডারদের কল্যাণে। হেঁকে হেঁকে কে কত দুর দাম তুললে। এখানে আমিই আমার বীডার। সুতরাং হাঁক আমিই দিতাম। দাম উঠত না, বলা বাহুল্য। শূন্য শূন্যই থাকত। কিন্তু আমি হাঁকতাম না, আমি কাঁদতাম। নীরব কান্না শুনেছেন কোনদিন? আমি

সেই নির্জনতার প্রতিধ্বনি। নিজেই গুহা নিজেই চীৎকার। শূন্যতার প্রাচীর বা চত্বর আমি স্বয়ং, যার ভেতরে শব্দ আঘাত পেলেই নিজের গতির দিশা পায়।
অতীতের ঘটনা।
তখন বাংলাদেশের জন্ম হয়নি।
বর্তমানে আমি আর দশ জনের মত। সংসার আছে ছেলেপুলে আছে। ছোটখাট ব্যবসার ধান্ধায় ঘুরে বেড়াই। তফাৎ যা আছে তা সামান্য। আমি ব্যাঙ্কে সেভিংস এ্যাকাউন্টের পক্ষপাতী নই। আমার সব এ্যাকাউন্টই কারেন্ট। কারণ, যে-কোন দিন ব্যাঙ্কে যাওয়া যায়। সেভিংসের শিকল পরতে আমি নারাজ। কিছু সুদ ধ্বংস হয়। কিন্তু আমি ত নিজের অস্তিত্ব, আসল পুঁজিই হারাতে বসেছিলাম। সেখানে সুদের লোভ আমাকে আর কী দিয়ে আকর্ষণ করবে? তাছাড়া ব্যাঙ্কে গেলেই আমার ফুর্তি খুব বেড়ে যায়। মনে এত প্রফুল্লতা আসে, কোথা থেকে আসে, খোদা মালুম। অবিশ্যি রোজ যেতে পারি নে। বয়স থাকলে, আর কিছু কাল নবিশী হতে পারলে আমি ব্যাঙ্কে চাকরী নিতাম। কিন্তু দারাপুত্রপরিবার নিয়ে এসব সৌখীনতা পোষায় না। মোদ্দা কথা, আমি দশের এক। ফারাকটুকু আপনাদের বলতে হোলো, নচেৎ আমার অতীত এবং বর্তমান আপনারা ঘুলিয়ে ফেলতেন। তবে মনের একটা গোপন বাসনা আপনাদের জানিয়ে রাখা যায়। ব্যাঙ্কের কোন রেষ্ট হাউস বিক্রি হলে এবং তখন আমার পকেট মোটা থাকলে, আমি কিনে ফেলব। নির্ঘাৎ। আমার জন্যে অমন বিশ্রামের জায়গা বেহেস্তেও কেউ তৈরী করতে পারবে না। আমার এই বায়নক্কার হেতু, ঈষৎ ধৈর্য ধরুন, নিজেই সহজে ধরে ফেলতে সক্ষম হবেন।

তখন আমি হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসতাম। যাযাবর সাজা খুব সহজ ছিল। কারণ, তখনও আমি কোন কুমারীর বর হতে পারিনি। আর শিরোপরি ছিলেন আব্বাজান। আকাশ এবং খোদার কথা উহ্য রাখলাম। কারণ, আমার সঙ্গে কোন সুবাদ ছিল না। আর চাইলেই টাকা পাওয়া যায়, সঙ্গে অপরিসীম স্নেহ, এমন খোদার সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয়নি। একদম লাগামহীন দিন। তারুণ্যের

তাগিদ। কাজেই প্রচরণশীল পাখির মত ডেরা আজ হিঁয়া কাল হুঁয়া। কেউ হুকুম দিলে, আকাশটা গালিচার মত গুটিয়ে দিতে পারতাম, তারপর যখন খুশী খুলে নাও যদি তোমার শোয়ার দরকার হয় বা উড়ে যেতে চাও। বুনো মোষ খেদিয়ে সেই কালে কোন ক্লান্তি ছিল না। বুনো হাঁসের পেছনেও ছুটতে রাজী ছিলাম। শুধু খেয়াল ইশারা দিলেই মেশিন চালু হয়ে যেতে। খেয়াল নয় সুইচ। বয়স যখন বয়স্য থাকে, নানা রঙের অভাব হয় না পৃথিবীতে। চ'রে বেড়ানোর বাতিক থাকলেও মাঝে মাঝে আস্তানা লাগে। কিছু ঘুম কিছু বিশ্রাম অপরিহার্য। কাজেই হোটেলের খোঁজ স্বাভাবিক। এমন আস্তানার প্রতি প্রেম সহজেই জেগে থাকে। যাযাবর শুধু পায়ে হাঁটে না। অনেক সময় পা যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত কল্পনা হয় ক্রাচ্। নির্জনে আবেগ নিয়ে খেলা করতে হোটেল সর্বোত্তম আশ্রয়। আশেপাশে মানুষ থাকে। তা বিরাট পুরো অন্ধকারের বুকে চিলতে আলোর বিন্দু। অন্ধকার আরো ঘনীভূত করে তোলে, ফিকে করে না। সুপরিবেশে সিংগেল-বেড হোটেলের কামরাও যাযাবর জীবনে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল।

সেই বয়সে ঠেকে গিয়েছিলাম। বানভাসি খড়কুটোর দশা। ভেসে যায়, কিন্তু স্থান নির্দেশ করে জলের ইচ্ছা।

আমি ঠেকে গিয়েছিলাম এক হোটেলে। শহরের নাম করতে পারব না। ওস্তাদের মানা আছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত কিনা, তাও নেপথ্যে থাক। কারণ, আমার সর্দির ধাত। কামরায় ওই বস্তু থাকলেও বোবা পড়ে থাকে। তবে আপনাদের বলা যায়, বেশ 'পশ্' হোটেল পশ্রার লায়েক আমি। দারুণ গচ্চা যায়। হিসেব দিলে অনেক গোস্বা হবেন। বিদেশী জিনিষ অনুন্নত দেশে! এই হোটেলের মতই। কিন্তু সথ চাপলে আমি রণমুখো ঘোড়া। আর পকেট ত আমার নয়। সবই পিতৃদেবের। সব মিলিয়ে আমি শাহান শাহ্। তুরানী বা তুর্কীরা বলে 'বেকার লিক্তার সুলতান লিক্তার।' To be a bachalor is to be a Sultan কুমার জীবন সুলতানের জীবন। অর্থাৎ তখন আমি রাজ্যের অধিশ্বর। হোটেল থোড়াই বাৎ। চিন্তা ভাবনা নেই। সবই নিজের এক্তিয়ার। নিদ্রা এবং আহার। ডাইনিং রুমে ইচ্ছে হলে যাই, নচেৎ বেড-সাইড টেলিফোন কথা বলে : রুম সার্ভিস প্লিজ। ঢাকা খাওয়ার পড়ে থাকে।

কারণ, সবই আমার নিজের মর্জি। আরো একটা কারণ ছিল, আমার বায়ুচারী হওয়ার। কামরাটা পেয়েছিলাম তোফা। সেই জন্যেই আরো ঠেকে যাওয়া। নচেৎ তিন চার দিনের বেশী কোন হোটেল আমার কাছে 'হেল্' (নরক) হয়ে ওঠে। এখানে এক হপ্তা কেটে গেছে। নড়চড়ের নাম নেই। কারণ, কামরার বাইরে দৃশ্য যেন সব আমার জন্যে সাজানো ছিল। বিরাট পার্ক, শহরের পাঁচতলা-সাততলা দালানের মিনার এবং নীচে সপিল রাস্তার মোহময় বাঁক যেখানে দিনের কলকোলাহল যতই থাকুক রাত্রে নিওন লাইট ও নির্জনতা পরস্পরে কোলাকুলি রত। আর আকাশ ত উপুড় হয়ে তখন আমার কানে কানে ফিসফিস করত। বিল যতই উঠুক বা-জান টাকা পাঠিয়ে দেবেন। তা-ছাড়া এখানকার ডাইনিং রুমের সাজ-সজ্জা রুচির পরাকাষ্ঠা। বিদেশী ম্যানেজার প্রতিদিন কোথা থেকে এত ফুল যোগাড় করে রাখতেন আল্লা মালুম। সুইমিং পুলটি বোধ হয় চরমতম আকর্ষণ। আশ্চর্য এক নীল মোজেকে তৈরী। যেন শারদীয় আকাশের এক চিল্‌তে সর্বদা উপরে চাঁদোয়ার মত টানানো আছে। নচেৎ পানি এমন সুনীল হয় কী ভাবে? বিদেশী রমণীরা সুইমিং কষ্ট্যুম পরে সন্ধ্যার পর যখন জলকেলি শুরু করত, নেপথ্যে কোন য়ুরোপীয় সঙ্গীতের টানা রেশ সহ, তখন মনে হোত, এই তিনতলা থেকে ঝাপ দিয়ে পড়ি। বলাবাহুল্য আমার কামরায় শুয়ে শুয়ে দুনিয়ার তনু-বাহার দেখা যেত। হালফিল বড় লোকদের দেশী মেমেরা পর্যন্ত ঝাঁপ দিতে আসত প্রতিদিন কৃষ্ণ অঙ্গ সমভিব্যাহারে। তা-ও নয়নলোভা। সাদা কালোর আলোছায়ায় জেল্লা-দার হয়ে উঠত হোটেলের কৃত্রিম ঝিল। কিন্তু দেহ ত অকৃত্রিম। নানা ছন্দ এবং ভঙ্গিমায় তার পরিবেশনা দর্শন অরসিকের নসীবে লেখা নেই। আমি মাঝে মাঝে কামরা থেকে ছুটে যেতাম সুইমিং পুলের পুলিনে। হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম। কিন্তু চিনি খাওয়াই উত্তম, চিনি হওয়ার মধ্যে কোন স্বাদ নেই। সাঁতার কেটে আমার পোষাত না। বরং এখানেও দৃশ্য-তপস্বী যাযাবর মুসাফির থাকা ভাল। তাই আবার কামরায় ফিরে আসতাম। অবসর যারা হাত বাড়ালেই পায়, তাদের কতগুলো ঝামেলা পোয়াতে হয়। বেশীর ভাগ মনের সঙ্গে। কিন্তু চোখ যদি পোষ-মানা থাকে, কেবল সৌন্দর্যের টানেই সব চাঞ্চল্য থিতিয়ে যায়। আমার কাছে স্নানের চেয়ে স্নানার্থিনী দর্শন আরো চিত্তাকর্ষক। রুচির ব্যাপার। কেউ আম

ভালবাসে, কেউ আমসত্ব। এই হোটেলে আহার পর্বও ছিল আকর্ষণীয়। সব সুখাদেয়। ন্যাপকিন পর্যন্ত কোন সুগন্ধির স্পর্শ-প্রাপ্ত। ফুলদানী নানা কায়দায় সাজানো। সব তাজা ফুল। পাউরুটির সুবাসে পেট ভরে যায়। এই সব আকর্ষণ ছোট করে দেখবেন না। ইন্দ্রিয়-সেবা এবং ইন্দ্রিয়ের সুস্থ পরিচর্যা দুই আলাদা ব্যাপার। গরীব দেশে সব জিনিষ এক-তরফা হয়ে গড়ে উঠে। তাই ভারসাম্য থাকে না। আত্মার পেছনে ছুটে যেমন মানুষ আর মানুষ থাকে না তেমনই ঘটে কেবলমাত্র দেহের পেছনে দৌড় মেরে। আহারও আমার কাছে আকাশ-বিহার। অশেষ কল্পনা। তা-ই ত ঠেকে গিয়েছিলাম। সাত-সাত দিন। বাড়ীতে চিঠি না লিখেও আর দু'একদিন কাটানো যায়। অবিশ্যি রাত্রে ফ্লোর শো' দেখার বাতিক আমার তেমন নেই। তবে মাঝে মাঝে একঘেয়েমী কাটাতে বেশ কার্যকর। এখানে নর্তক-নর্তকীর সংখ্যা তিন চার জন। রোজ রোজ থোড়-বড়িখাড়া এবং খাড়া-বড়ি-থোড় করা ধাতে পোষায় না। টাকার মামলা ত আছেই। বেশীর ভাগ নাচ একই রসে গিয়ে ঠেকে। কোন দিন তা-ও নির্ভেজাল আদি রস। আমি তাই ওই বাবদ তেমন পয়সা খরচ করিনি। আর এই বয়সে এক পয়সা রোজগারে মুরোদ-হীন, অথচ বাড়ী থেকে টাকা চাইব, কেমন আত্মসম্মানে বাধত। অবিশ্যি তা কালেভদ্রের ব্যাপার। সাত দিন হয়ে গেছে বলেই এসব ধানাই পানাই করছিলাম। হোটেল যতই আরামদায়ক হোক, এবার 'হল' হতে শুরু করেছে। ভাবলাম, একবার বাড়ী গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার কোথাও বেরিয়ে পড়া যাবে। আপাততঃ এখানে জোর একদিন থাকা চলে। দরকার মনে করলে, আবার ফিরে আসা যাবে। সুইচ ত নিজের কাছে। 'অফ' কী 'অন্' করার মালিক আমি স্বয়ং। অত ভাবনা কেন? আর একদিন থেকে হোটেল ছাড়ব।

পরদিন সকালে যথারীতি ডাইনিং রুমে নাস্তার জন্যে হাজির হয়েছি। হাতে একটা বাংলা দৈনিক। খাওয়া শেষ। চা-স্তরে আছি। একবার কাগজে একবার কাপে চুমুক দিচ্ছি।

ডাইনিং রুমে বেশ লোক আছে। প্রায় বোঝাই। আমি একটা দু'সীট-ওয়ালা ছোট টেবিলে বসেছিলাম। আমার সামনেটা খালি। চেয়ার অবিশ্যি আছে।

কাগজের সমতলে চোখ ও মন। হঠাৎ চেয়ার টানার শব্দে চোখ তুলে তাকালাম। এক মহিলা এই নাদব্রহ্মের অধিষ্ঠাত্রী। আমি আবার চোখ নামাতে যাব। তখনই বাধা পড়ল।

"আপনাকে ডিস্‌টার্ব করলাম না ত?" মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে, বসার আনচান করছেন।

"না, না। বসুন বসুন।" আমার সলজ্জ জবাব। তবে এবার আমি সার্ভেয়ার। বাক্যের উৎস দেখে নিতে চেষ্টা করলাম।

শ্যামাঙ্গিনী মহিলা। তন্বী। বাকী কালিদাসের সঙ্গে তেমন মেলেনি। চোখ দু'টি সাধারণ সাইজ। তবে ঝিলিক আছে এবং তা অস্তস্ফূর্ত। তিনি পরে আছেন আকাশী-নীল শাড়ী। সঙ্গে মানান-সই ব্লাউস। কাটা বগল।

নবাগতা ইশারায় বয়কে ডেকে থাকবেন। আমি তার অর্ডার শুনলাম; ফ্রুট জুস্‌, সসেজ দু'টো আর ডিম—ওয়াটার পোচ।

আমার চা প্রায় শেষ। আর বসে থাকা শোভন নয়। উঠিউঠি করছিলাম। কিন্তু আবার নেপথ্যে নেদা (শব্দ) কানে ঘা দিলে; "ট্রেন জানিতে জান শেষ। তাড়াতাড়ি চা দরকার। এখানে সার্ভিস কেমন? তাড়াতাড়ি হবে ত?"

জবাব দিতেই হয়। প্রতীক্ষা-উত্তর দুই চোখ আমার মুখের উপর। আমার দুই চোখ হঠাৎ অপর জোড়ার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল। মহিলার মুখের রং দেখছিলাম। এমন শ্যাম রং আছে নাকি পৃথিবীতে?

দায়সারা জবাব দিয়েছিলাম হঠাৎ দৃষ্টি নামিয়ে। সার্ভিস ভাল "তবে ভাড়া আছে, আপনি বলে দিলে পারতেন।"

"ভুল হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি।" বলে উঠে পড়লাম এবং কোণায় সহকারী একজনকে এমার্জেন্সী বয়ান করা গেল।

এবার রুমে ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু তা আমার এক্তিয়ারে ছিল না। আমি আবার নিজের সীটে ফিরে গেলাম সুসংবাদ দিতে।

"অশেষ ধন্যবাদ, আপনি ক'দিন আছেন এখানে।"

"দিন সাতেক।"

"আপনার সব জানা হয়ে গেছে। কাগজটা দেখতে পারি?"
"নিশ্চয়।"
"সকালে কাগজপড়া অভ্যেস। এখন অবস্থা গুণে—"এই কথাটুকু শেষ না রেখেই মহিলা কাগজের মধ্যে ঢুকলেন।
সমস্যায় পড়লাম। ওর মুখ আর দেখতে পাইনে। কাগজে ঢাকা। নবাগতা মুখ থেকে কাগজ নামিয়ে সোজা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে বললেন,
"ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। আপনার রুম নম্বর কতো?
"দুশ উনত্রিশ।"
"বহুৎ আচ্ছা। আমার দুশ' ত্রিশ। একদম প্রতিবেশী।" তারপর সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আবার যোগ করলেন, বাচালতা ঘটলে মাফ করবেন।
"না—না—কী যে বলছেন।" আমি যেন সরে পড়তে পারলেই উদ্ধার পাই। কেমন অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু আশ্চর্য অন্যদিকের কণ্ঠ-স্বর। জড়তা বা সঙ্কোচ এতটুকু নেই। বাঙালী মেয়ে এত সহজ! আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যুগান্তের জড়তা 'ক' বছরেই সাফ হয়ে গেছে নাকি?

কাউন্টারে রুমের চাবি নিতে গিয়ে দুশ' তিরিশ নম্বরের সদ্য-মালিকের নামটা জানার কৌতূহল জাগল। আড়চোখে দেখে নিলাম: আয়েশা চৌধুরানী। মিস ম্যাডাম কিছুই লেখা নেই। দেখে মনে হয় কোন ধনী-নন্দিনী এবং তরুণী। তবে বিবাহিতা হ'লে তরুণী-সুলভ আদল থাকবে না, এমন গ্যারান্টি কে দেবে?
আমি কামরা অভিমুখী। কিন্তু আয়েশা চৌধুরানী আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন, যদিও আমার বিলক্ষণ জানা, তিনি, এখন সসেজে ছুরি চালিয়ে কাঁটা দিয়ে নিজের রক্তিম ঠোঁটে তুলছেন। একদম কাঁধের ফেরেশ্‌তার মত, তিনি হাঁটছেন আমার পাশাপাশি। ডান দিকে চোখ ফেরাই, মোতায়েন ফেরেশ্‌তা ঠিক আছে। বাম দিকে সেই দশা। আয়েশা চৌধুরানী আমার সঙ্গ নিয়েছেন, প্রেতিনী যেমন অন্ধকার রাত্রে করে থাকে, নিঃসঙ্গ কোন পথিক দেখলে।
লিফটে ঠিক ঢুকল এবং বাঁদিকে অবস্থান। তাড়াতাড়ি আমি কামরার ভেতর গেলাম। চৌধুরানীর কোন প্রত্যয় নেই। আমি চেয়ারে বসে

পড়লাম। সে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, "আপনাকে ডিস্‌টার্ব করলাম না ত?" "না, না।" বেশ জোরেই জবাব দিয়ে ফেলে পরে লজ্জা পাই। বারেক সিংগেল-সীটের রুম। নচেৎ আর কেউ থাকলে হাসত বৈকি। সিগারেট ধরালাম তাড়াতাড়ি। ধোঁয়াগুলোর ভেতর কালো চুল আন্দোলিত হতে লাগল, মাঝে মাঝে মুখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, লজিক ছাড়া যে-ভাবনাদের উদয় এবং বিলয় ঘটে।

কিছুক্ষণ পরে পাশের কামরার দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। একটু সচেতন হলাম। এবং ভাবতে লাগলাম, ব্রেকফাষ্টের পর তিনি ফিরলেন। এবার তিনি নিজের কামরায় যেতে পারেন আমার এখানে বসে কেন? কিন্তু তা-কে হটাতে পারলাম না। দুশ' তিরিশ নম্বর রুমে ফ্লাশ-টানার শব্দ হোল। আরো জলজ শব্দ। বোধ হয়, বাথ-টাব পূর্ণ হচ্ছে। ফ্লাসে নামবেন চৌধুরানী।

বাইরে সুইমিং পুল একদম নির্জন নয়। দুই শ্বেতাঙ্গিনী সলিল-কেলি শুরু করেছেন, একে অপরের গায়ে জল ছিটিয়ে হল্লারত। কিন্তু আমার চোখ সেদিকে অন্ধ। আমার আগ্রহ পর্যন্ত নেই চোখ সজাগ হোক। চেয়ারের সামনে বসে আছে এক চৌধুরানী। শুধু দেওয়ালের ব্যবধান, নচেৎ সেখানেও আর এক জ্যান্ত চৌধুরানী বিরাজমান। অবয়ব এক। তফাৎ, একজন ছায়ার তৈরী, অন্যজন রক্তে, মাংসে, নির্দয়তায়।

প্রেতের অনড়তা দেখে আমি তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বেরিয়ে এলাম। শহরে দু' চক্কর দিয়ে আসা যাক। ট্র্যাক্সির সীট পাশেই পূর্ণ হয়ে গেল চড়ার সঙ্গে সঙ্গে। অপচ্ছায়ার হাত থেকে মুক্তি নেই। আবার সংলাপ জুড়ে দিলে।

—কী ভাবছেন?

—আপনার কথা।

—কেন?

—আমার পিছু নিয়েছেন কেন?

দুরন্ত হাসি সমস্ত নগরের দুপুর তারস্বরে বিদ্ধ করে ক্ষান্ত হোলো।

—কেন এমন হয়?

—সব কী জানা যায়?

—কাল চলে যাচ্ছেন?

—না। এই হোটেলেই আমি থাকব যদ্দিন না আমি ভূত হয়ে আপনার পিছু পিছু ছুটতে পারি। সহজে রেহাই পাবেন মনে করেছেন?

—ভূত হবেন না? দোহাই।

ট্যাক্সির গতি বেশ বেড়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সোজা রাস্তা পেয়ে। হাসির উন্মাদনায় তা দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

খামখা সময় এবং পয়সা নষ্ট। একদম লাঞ্চ সেরে উপরে উঠে যাব। তারপর যা-হয় হোক। একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়লাম। অর্ডার-দান সমাপ্ত। অপেক্ষার্থী।

আবার চেয়ার-টানার আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠ সংযোজিত, "কোথায় ছিলেন, মিঃ মজুমদার?" বোঝা গেল, তিনি আমার নাম সংগ্রহ করেছেন। আরো বামা-স্বরের বিস্তার, "আমি গোসল সেরে আপনার খোঁজ করলাম। দরজা বন্ধ। ভাবলাম লাউঞ্জে আছেন। সেখানেও হতাশ।"

আমি মনে মনে নিজেকে তখন শাপান্ত করতে লাগলাম। বেকুফিরও হদ্দ থাকে। আমি ইডিয়টদের চ্যাম্পিয়ন।

—অর্ডার দিয়েছেন?

—দিয়েছি।

—দেখা যাক কী খাওয়া যায়।

মেন্যু নিয়ে চৌধুরানী নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। পরে অর্ডার। প্রায় আমার সঙ্গে মিলে গেল। বিফ্‌ষ্টেক, ফিশ্‌ ফ্রাই, সুপ্‌।

আমি আগেই খাওয়া শুরু করে দিলাম। এত সৌজন্যের কী বালাই পড়েছে। তবে আমার চোখ প্লেটে কদাচিৎ পড়ে। টেবিল-সঙ্গিনীর গতিবিধির দিকে দৃষ্টি স্বতঃই ছুটে যায়।

খেতে খেতে বললেন, "ভালই হোল আপনাকে পাওয়া গেছে। একা একা লাইফ সব সময় 'ডাল'। বাংলা-ইংরেজী দুই।" তারপর তিনি কিশোরীসুলভ হাসিতে ফেটে পড়লেন যা অন্য টেবিলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি হাসলাম নিতান্ত দাঁতের উপর দিয়ে।

"কোথা গিয়েছিলেন?" আবার প্রশ্ন।

"শহরে দরকার ছিল।"

"আমার ভাগ্য প্রসন্ন, আপনি যথাসময়ে এলেন।" এই বাক্যের অর্থোদ্ধারে আমার মন এগোয় না। তবে অসম্ভব এক পুলক অনুভব করছিলাম খামখা।

চৌধুরানী বীফষ্টেক্ কাঁটায় গেঁথে মুখে না তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে?"

"না।" দাঁতের গোড়ায় একটা কাঁটা লেগেছিল, তা জিভ দিয়ে এক পাশে সরাতে সরাতে জবাব দিলাম।

"আমার বদভ্যাস দুরন্ত। দুপুরের ঘুম ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার।"

"অভ্যেস নিজস্ব। বদ নয়।" আমার জবাব যেন চৌধুরানী কানে নিলেন না, বরং বলে চললেন, "মানুষে মানুষে কিছু গরমিল থাকা বাঞ্ছনীয় নচেৎ লাইফ 'ডাল' হয়ে যেত। এবার ইংরেজী ডাল ধরে নেবেন।" হাসতে লাগলেন টেবিলসঙ্গিনী। আমি মৃদুনাদে যোগ দিলাম।

এবার আর ছায়া নেই পাশে। সজীব মানবী। আমি হাঁটছিলাম না নেশাগ্রস্ত পা ফেলছিলাম, নিরূপণ দুঃসাধ্য। চৌধুরানী তার কামরায় ঢুকে গেলেন আর কোন কথা না বলে। নিশ্চয় ঘুম পেয়েছিল। আমি ঝুট বলেছিলাম। দুপুরের ওই বদভ্যাস আমার কম নয়। পাপের শাস্তি ভোগ করতে হোলো। আমি ঘুমোতে পারলাম না। চেয়ারে বসে আছে অপচ্ছায়া! আমার দিকে চেয়ে কুটীল হাসি হাসছে। একবার ভেবেছিলাম, হোটেল ছেড়ে দিই। কিন্তু, তা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। বরং বাড়ী থেকে টাকা আনার বন্দোবস্ত করে ফেললাম।

পরদিন একই ভাবে কাটল। সোয়াস্তি নেই। মনের কাছে প্রশ্ন করা অবান্তর। কারো সান্নিধ্য কাম্য হোলে মগজে এমন গোলতাল পাকিয়ে যায়, আমার জানা ছিল না। কিন্তু অন্য দিকের হদিস আমাকে কে দেবে? সেদিনই রাত্রে হঠাৎ দরজায় নক্। মৃদু শব্দ। তিনচার বার। বেড-সুইচ টিপে দেখলাম রাত প্রায় পৌনে একটা। আমাকে কারো ত বিব্রত করার কথা নয়। কারণ, দরজার নবে "ডু নট ডিসটার্ব" কার্ড ঝুলিয়ে শুয়েছিলাম। আমি সকালে উঠব না। দরকার হয় ব্রেকফাষ্ট রুমে আনিয়ে নেব।

বেশ বিরক্তি ধরে গেল। তবু উঠে দরজা খুলে দাঁড়াই। সামনে চৌধুরানী। আমি মুখ খোলার আগেই তিনি বলে ফেললেন, "সরী। আমার

ঘড়িটার দম দেওয়া দরকার। বন্ধ। অথচ সকালে ওঠা জরুরী। কিছু মনে করবেন না। ক'টা বাজে আপনার ঘড়িতে?"

"একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

চৌধুরানী তারপরও একটু দাঁড়ালেন ঘড়িতে দম দিতে। করিডরে নিওন লাইট জ্বলছে। চৌধুরানী নাইলনের শাড়ী পড়ে উঠে এসেছেন। পেটীকোট পর্যন্ত নেই। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম।

ধন্যবাদ দিয়ে প্রেতচ্ছায়া বিদায় নিলে। আমি দরজা বন্ধ করলাম। কিন্তু হঠাৎ বড় হাসি পেয়ে গেল। দশ বছর আগে শওকত ওসমানের এক গল্পে নাইলনের লেবাসের বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম: "এই পরিচ্ছদ কাঁটাতার-ঘেরা সরকারী সংরক্ষিত এলাকার মত। মাল হেফাজতে রাখে কিন্তু দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটায় না।" হেসে উঠেছিলাম। কিন্তু চেয়ারের দিকে চেয়ে মন বিষাদে ভরে গেল। অর্ধোলঙ্গ অঙ্গনা তা পূর্ণ করে বসে আছে।

যন্ত্রণার ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। অতীত যখন সত্যিই অতীত।

দু'দিন পরে লাঞ্চের পরে করিডর দিয়ে হেঁটে, হেঁটে আসার সময় আমি সঙ্গিনীর এক হাত নিজের হাতে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়েছিলাম। হঠাৎ চলা স্থগিত। তারপর মৃদু হাসি-সহ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে তিনি চেয়েছিলেন। সেই গোস্বার বয়ান আমার দুঃসাধ্য। যেন শিবনেত্র। দু'মিনিট তাকিয়েই মহিলা নিজের কামরায় ঢুকেছিলেন। দরজা যে-শব্দে বন্ধ হোলো, তা-থেকে অনুমান করা যায়, নিরীহ কাঠ পর্যন্ত খর্পর থেকে বাদ যায়নি। মর্মে মর্মে আমার মৃত্যু ঘটল। কিন্তু ডিনারের সময় আবার সহজ ভাবে পেছন থেকে তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে চমক খাইয়ে দিয়েছিলেন। ছলনাময়ীর ছলনার হদিস কে আমাকে দেবে?

আত্মনিগ্রহ পেয়ে বসলে তা বিলাসে পরিণত হয়। তাই বেশ ঘুমিয়ে-ছিলাম সেই রাত্রি। একটানা। বেশ একটু দেরী হয়ে গেল আমার উঠতে। আর শেভ্ করলাম না। তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে নিলাম। দরজা খুলে দেখি, বাইরের 'নবে' একটা সাদা কাগজ ঝোলানো। তাড়াতাড়ি খুলে নিলাম। ছ' ইঞ্চি লম্বা আর

ইঞ্চি তিনেক কাগজে নিম্নরেখা-সমন্বিত কালো অক্ষরে ফাঁক ফাঁক করে লেখা : কে প্রা দে

আমার বিস্ময়ের অবধি থাকল না, বলা বাহুল্য। তাড়াতাড়ি কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দরজা বন্ধ করে এগোতে লাগলাম।

আমাদের টেবিল প্রায় রিজার্ভ করে রাখার মত। আর কোন বোর্ডার সেখানে বসত না। আজ দেখলাম, তখনও দুই চেয়ার শূন্য। তাহলে শুধু আমিই লেট্ না।

অর্ডার দেওয়া গেল। বেশী অপেক্ষা করলাম না। সোয়াস্তি-অসোয়াস্তি যেখানে পরস্পরের প্রতিযোগী সেখানে প্রতীক্ষা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

চা শেষ করে আসার মুখে বয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "মেম সাহেব নাস্তা করে গেছেন ?"

"তিনি ত চলে গেছেন। তার হাজব্যাণ্ড এসেছিল (অভিজাত হোটেলে বয়দের এসব ইংরেজী ডালভাত) ওকে নিয়ে যেতে। চৌধুরী সাহেব ফরেষ্ট ডিপার্টের লোক। ট্যুরে গিয়েছিলেন, ওকে এখানে রেখে," বয় গড়গড় মেল চালিয়ে দিলে।

"চলে গেছেন ?" আমার স্বর খেদোক্তির কাছাকাছি যেতে যেতে বিকৃত। বয়ের কাছে না ধরা পড়ে যাই।

"হ্যাঁ, সার।"

আমি কামরায় ফিরে এলাম। টেবিলের উপর কাগজটা পড়ে আছে। হাতের লেখা আমার চেনা। কাউণ্টারে দেখে এসেছি।

এক অসম্ভব অস্থিরতা পেয়ে বসল। কী অর্থ এই সাংকেতিকতার ? কী বলতে চেয়েছিল সেই ছলনাময়ী ?

মাত্র ক'টা অক্ষর। কিন্তু বিভীষিকার মত চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। বৈদিক ধর্মীয় মন্ত্রের কয়েকটা শব্দই থাকে যা অক্ষরে লেখা যায়। অথচ তা কোটী কোটী মানবকে বুঁদ করে রাখে।

কে···প্রা · দে···

আমার মগজের মধ্যে আর কোন শব্দ ঢোকে না। চোখের সামনে থেকে তাবৎ অক্ষর লুপ্ত। সেদিনই হোটেল ছাড়লাম। কিন্তু শব্দ এবং প্রেতচ্ছায়া সঙ্গে সঙ্গে আছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে চোখ বোঁজার চেষ্টা করতাম, কিন্তু 'কেপ্রাদে' বজ্রনাদের মত গর্জন তুলত। আমার সব সোয়াস্তি

সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লুপ্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নিভ্‌তে লাগল পার্থিব আনন্দ। ধনীর দুলাল আমি। কিন্তু বিভীষিকার মত্ত হস্তী আমাকে শূন্যে তুলে বার বার কঠিন পাথরের উপর আছড়ে ফেলতে লাগল। আমার অস্তিত্ব চুরমার হতে লাগল মুহূর্তে মুহূর্তে। পরিত্রাণ নেই। কী ছিল তার বাসনায়, যদি রাক্ষুসী একবার বলে যেত। ওই সামান্য কৌতূহল জীইয়ে রেখে একটা মানুষকে ধ্বংস করে কী তার আনন্দ ?

আমি নির্জনে কাঁদতাম বালকের মত। লোকালয়ে নিঃশব্দে। হোটেলে হোটেলে অথবা সার্কিট হাউসে বহু ঘুরলাম। শেষে পাগল হওয়ার উপক্রম। রাত্রে ওই শনি-মূর্তি তিনটে শব্দ দেখতাম আর তার অর্থ করতাম নিজের মত। কখনই সন্তুষ্ট হতে পারতাম না। অতৃপ্তির দংশন মগজ লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ছিল।

আর কিছু দিন গেলে আমি বদ্ধ পাগল হয়ে যেতাম।

একদিন আমার ব্যাঙ্কার বন্ধু নাসির আহমেদ রাত্রি ন'টার দিকে এসে উপস্থিত। অসময়। তার আড্ডার বাতিক চেগেছিল। সে সোজা বেড রুমে হাজির। আমার পবিত্র মন্ত্র-সম্বলিত কাগজটা বিছানায় পড়ে। লুকিয়ে ফেলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সে হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এটা কী ?"

"সংক্ষিপ্ত শব্দ। পুরোটা কী ?" আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম, যদিও আমার বুক দুম্‌ড়ে যাচ্ছিল।

নাসির মৃদু হেসে বললে, "অর্থ খুব সোজা। কেবল প্রাপককে দেয়। A/C payee এ্যাকাউন্ট পেয়ী। বুঝলি না ?"

কেবল···প্রাপককে···দেয় ? ? ? ? কে প্রা দে।

মনে হলো, শত নাগপাশে জড়ানো আমার দেহ থেকে সরীসৃপগুলো নিমেষে ছিট্‌কে সরে গেল।

আমি হো হো হাসতে লাগলাম।

আনন্দের হাসি।

নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রতি হাসি।

মনিব ও তাহার কুকুর

এক

পরস্পরবিরোধী দুই সামাজিক শক্তি বা প্রবণতা যখন হেস্তনেস্ত মোকাবিলায় দাঁড়ায় তখনই সংকটের সূত্রপাত হয়। মানুষ, ঘটনা, পরিস্থিতি—নানা উপাদান পেছনে থাকে। ফলে সংকটের তালিকা করা দায়। সেই জন্যে প্রধান কোনো একটি উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং সেইভাবে সংকটের নামকরণ ঘটে। যথা, জাতীয় সংকট, রাজনৈতিক সংকট, পারিবারিক সংকট ইত্যাদি।

হাল আমলে নৈতিক সংকটের একটা বড়ো উদাহরণ : উৎকোচ বা ঘুষ। দেশী-বিদেশী বহু সমাজচিন্তাবিদ তথা অর্থনীতিবিদ অনুন্নত দেশে এই ব্যাধির উল্লেখ করে থাকেন। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মিরদাল একাধিক বার বলেছেন যে দুর্নীতি থেকে সূত্রপাত স্বৈরাচারের। অনুন্নত দেশে এই ফাটল ধরে হাজির হয় সামরিক শাসন।

উৎকোচ প্রধানত টাকা-পয়সা বা সম্পদের লেনদেন। কিন্তু তা অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিণাম সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যের দিগন্ত ক্রমশ সংকুচিত হয়। ব্যক্তিমানুষ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে আকারহীন পিণ্ডের দোসর বনে যায়। কবন্ধের জুলুম শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে।

সংকট-সমাধানের কথা বহুজন ভেবে থাকেন। কিন্তু সেইখানে পথও মসৃণ অথবা সমস্যা সহজ নয়। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সম্পত্তি-সম্পদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই গাজর গর্দভের সম্মুখে ইনসেনটিভ বা প্রয়োজক হিসেবে ঝুলন্ত না রাখলে তার চলৎশক্তি খোলে না। শাস্ত্রকারগণ কর্মযোগীর কথা বলেছেন, যারা ফলের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই ব্রত-সম্পাদনে সদা মোতায়েন থাকেন। আদর্শ হিসেবে তোফা। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ প্রয়োজকের কথা ভাবতে হয়।

তখন সামাজিক পুরস্কারের নিশান টানানো ছাড়া পথ থাকে না। ইউ-টোপিয়ার নকশা আঁকা সহজ। বাস্তব রূপে তা পাওয়া দায়। লোভ বজায় রেখে মানুষকে নির্লোভ করার দায়িত্ব হয়ত সকল যুগেই থাকবে। খ্যাতি, যশ, মান—গুণান্বিত লোভেরই এক দিক। সামাজিক পুরস্কার যতখানি নির্বস্তুক হয়ে উঠবে জীবনযাপনের বস্তুভিত্তির উপর, সেই সমাজের পরাকাষ্ঠা ততখানি। একথা বর্তমানে সকলে স্বীকার করেন।

উৎকোচ-প্রসঙ্গে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

এতৎসঙ্গে অবিশ্যি স্মর্তব্য—বারাঙ্গনা মাত্রেই ছিল একদা অরমিত কুমারী।

দুই

নায়কের নাম এই কাহিনীতে উহ্য। তাকে আমরা রাজপুরুষ বলব। বড়ো নয়, তবে পদ অফিসারের। যদিও কোনো এক বিভাগের কর্মচারী নিয়ে কথকতা, তবু এমন নৈতিক সংকট কেবল ওই এক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবিকার নানা পর্যায়ে এমন দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে। বেতন-দাতাও এই গণ্ডির মধ্যে পড়ে। তারও জীবিকা আছে। এমন ব্যাপক অর্থেই জীবিকা শব্দটি এখানে গৃহীত। লেখক, প্রকাশক, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক, ফার্মের স্বত্বাধিকারী, বিজনেস হাউসের পরিচালক অগয়রহ—যে-কেউ বিভিন্ন রূপে এমন নৈতিক-সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। শুধু কাহিনী-কথনের সুবিধার জন্যে এক ব্যক্তি বা বিভাগের উল্লেখ আছে। তাই কারো নাম খুঁজতে যাবেন না। সব বিমূর্ত। কোথাও পেশা, কোথাও সম্পর্কের সড়ক ধরে সকল সম্বোধন সম্পাদিত।

কলেজে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তারপর দশ বছর লা-পাওা। রাজপুরুষ অবাক হয়ে যায়, এক সাবেক সহপাঠী বাড়ি এসে উপস্থিত।

কারো অবয়বে তেমন অদলবদল ঘটে নি। সুতরাং নিমেষে চেনা-পর্ব সমাপ্ত।

—তুমি!?!??

—তুমি!!!???

—বসো বসো। বাড়ি চিনলে কী করে?

—গেজেটেড অফিসারদের বাড়ি কাক-পক্ষী চেনে।

—কোথা ডুব দিয়ে ছিলে এতদিন?

—বলব বইকি। সজনি, সব ধীরে—ধীরে।
সহপাঠী এবং রাজপুরুষ অনেক অতীত ইতিমধ্যে চায়ের কাপের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল।
রাজপুরুষ কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছিল, ফল খুব ভালো হয় নি। শেষে কাস্টমস—শুল্কবিভাগে এক হিল্লে হয়। সহপাঠীর কোনো স্থায়ী জীবিকা নেই। যখন যা জোটে গা ভাসিয়ে দেয়।
ছুটির দিন ছিল না বলে সেদিন আসর জলদি ভেঙে যায়। পরবর্তী শনিবারের বিকেলও রোববারে সব অন্ধকার দূরীভূত। দশ বছর আর গত দশ বছর থাকে নি। পুরাতন সাহচর্য নতুন হয়ে উঠল। এক মাসে উভয়ের আরো মজলিস বসল। সহপাঠী আসর গুলজারে অদ্বিতীয়। পুরাতন সকল খেই পাকড়াতে কারো বিলম্ব হয় নি।
একদিন রাজপুরুষের আপিসে টেলিফোন বেজে উঠল।
—হ্যালো। রাজপুরুষের হাতে রিসিভার।
—অবসর আছে?
অন্য পারে প্রশ্নকর্তা সহপাঠী।
—আছে। তোমার জন্যে আছে।
—অফিসার মানুষ। আমাদের মতো টোটো কোম্পানি নও। তাই আগেভাগে নোটিশ।
—এসো। চা খেয়ে যাও।
—আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি।
সহপাঠী অতঃপর হাজিরা দিয়েছিল। হাতে এক সুশোভন ব্রিফকেস। যদিও চায়ের কাপের উপর বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পলিসি ঠিক হয়, সহপাঠী সেদিন তার উদ্দেশ্য উহ্য রেখেছিল। শুধু সাহচর্যের লোভেই তার উৎপাত—বিদায় নিয়েছিল, এমন ভাব পেছনে রেখে।
তিনদিন পরে এবার আপিস নয়, বাড়ি চড়াও সহপাঠী।
—কী খবর, ওল্ড বয়? রাজপুরুষ অভ্যর্থনা জানায়।
—খবর আছে বইকি।
—একটু বসো। চা আনিয়ে নিই।
পরিস্থিতি তরল করতে সেদিন সহপাঠীর কোন সংকোচ ছিল না। শুল্কবিভাগে তার একটা জরুরি কাজ আটকেছে। জীবিকার কোন বাঁধা

রাস্তা নেই। জাবনা অনুযায়ী বাথান-বদল। বর্তমানে সে 'উজানী ট্রেডার্স' নামে এক ফার্মের সঙ্গে জড়িত। তাদের একটা কেস আছে কাস্টমসে।

—উজানী ট্রেডার্স? না, তেমন কোন ফাইল এখন আমার কাছে আসে নি।

—আসে নি। তবে আসতে পারে। তুমি ঠিক জানো আসে নি? সহপাঠী সন্দেহ প্রকাশ করে।

—বহু ফাইল পাশ হয়। তবে ও-নামে কিছু আসে নি। যদি আসে—

—ধরে রেখো। আর আমাকে খবর দিও।

—কেসটা কী?

—কোন একটা অ্যানোমালি অর্থাৎ অসংগতি আছে। আমার সব জানা নেই। পরে বলব।

রাজপুরুষ আশ্বাস দিয়েছিল, 'তুমি ইন্টারেসটেড। উজানী ট্রেডার্স—নাম মনে থাকবে বইকি। তবে খোঁজ নিও।'

—তা নেব বইকি। আমার তো যখন-যা-পাই-ধরে-খাই-গোছের জীবিকা। খোঁজ নিতেই হবে।

—আমি চট করে কিছু করে বসব না, তুমি যখন ভেতরে আছো।

—ধন্যবাদ।

ধাইয়ের কাছে কোঁক চাপা থাকে না। রাজপুরুষের কাছে দু-তিন দিনের মধ্যে সব হদিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দেখা যায়, 'উজানী ট্রেডার্স' লাইসেন্স-অধীন কিছু মাল আমদানি করে। পরিমাণে অসংগতি ত আছেই, তাছাড়া বাজারে মালের চলতি যা দাম ইনভয়েসে দাম তার চেয়ে ঢের কম। একে আণ্ডার-ইনভয়েস বলে। ইনসপেক্টার এইসব গরমিল-অনুযায়ী রিপোর্ট দিয়েছে। আইনত অপরাধ। মাল বাজেয়াপ্ত, জেল, জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল—সব-কিছু হতে পারে। অফিসার বিচারকর্তা।

সহপাঠী বাড়ি এসে ধরনা দিলে। একদম ককানো অনুরোধ: বাঁচাও।

—আমি কী করতে পারি? বাঁধা আইন।

—তুমি পার।

—তোমার খাতিরে ওদের জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া যায়।

—তা হলে ব্যবসার আর থাকবে কী ? লাইসেন্স বাতিল। আমারও রুজি গেল।

—ব্যবসা থাকবে না কেন ?

—বাজারে সুনাম গেলে আর ব্যবসা থাকে ?

—ইনসপেকশানের সময় ধরাধরি করে নি কেন, ভেতরে যখন গলদ ?

সহপাঠী চেপে গিয়েছিল। ওদের চেনা ইনসপেক্টর ইতিমধ্যে বদলি হয়ে যায়। ফলে, এই গণ্ডগোল। চোরের দশ দিনের জায়গায় এবার গেরস্থর এক দিন এসে গেছে। গেরস্থ এখানে শুল্কবিভাগ।

মাকু ঠেলাঠেলি চলল দু-তিন দিন।

পুরাতন ঘনিষ্ঠ সহপাঠীর অনুরোধ। ফাটা অসোয়াস্তির মধ্যিখানে পড়েছিল রাজপুরুষ।

ভালো ছাত্র ছিল কলেজে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রাজপুরুষের চোখ যায় নি, এমন অপবাদ কেউ দেবে না। সামাজিক সমস্যাবলী তার ধী-শক্তিসমীপে আছাড় খেত বইকি। কিন্তু তেমন আমল পেত না। তার সহপাঠী অনেকে রাজনীতি নিয়ে বেশ মশগুল ছিল। রাজপুরুষ তর্কচ্ছলে সময়-কাটানোর নিমিত্ত হিসেবে তাদের গ্রহণ করত। তার বেশি না। সামাজিক দায়িত্ব মানুষের আছে। কিন্তু সেই বোঝা বইতে লাখ-লাখ মাথা প্রয়োজন। সেখানে একটি মাথা না থাকলে কী আসে যায় ? এবঙবিধ আঁচড় লাগত রাজপুরুষের মনে। অন্যদিকে 'কেরিয়ার'-গঠনের উচ্চাশার কোনো ভেলকি তার সামনে ছিল না। চার বছর চাকরি হয়ে গেল। সে উপরি-রোজগারের কথা কোনদিন ভাবে নি। যদিও তার কানে পড়ত উর্ধ্বতন-অধস্তন সহকর্মীদের কপাল-চমকানোর কথা। শুল্কবিভাগে আইন আছে। সেই মাপকাঠি দিয়ে ফাইলের উপর বিচরণ এবং মন্তব্য-দান ছাড়া একটি অফিসারের আর কী কাজ থাকতে পারে ? অন্য কিছু ভাবত না রাজপুরুষ।

সহপাঠীর অনুরোধ তার কাছে প্রথম ধাক্কা এবং তা আশ্চর্যজনক। তার অধস্তন কোনো সহকারী তার কাছে বায়না ধরে নি কোনদিন। যদিও স্বভাবে পরিহাস-প্রিয়, কিন্তু আপিসে রাজপুরুষ রীতিমত আমলা অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাট। আপিসে গল্প করা ছিল তার ধাতের বাইরে। সবাই জানত, বড়ো রাশভারি অফিসার।

সহপাঠী পরদিনই বাড়িতে এল ধরনা দিতে। অসোয়াস্তি আছে, তবু

রাজপুরুষ কোন ত্রুটি রাখে না অভ্যর্থনায়। অবিশ্যি সব কথা শেষে গিয়ে এক জায়গায় ঠেকে।

—কী করবে ভাবছ? সহপাঠীর প্রশ্ন।

—কিছু করা যাবে না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখো।

—অনুরোধ কী করে রাখব?

—তুমি ইচ্ছে করলে পার।

অন্দর থেকে এই সময় একটা কালো রঙের পুড্‌ল্‌ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। এইজাতীয় খুদে সাইজের কুকুর কয়েকবার রোয়াব ঝেড়েই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রাজপুরুষ ওটাকে সামলে নিজের কোলে তুলে নিলে। কুকুরের কালো পশমী জঙ্গলে বিচরণশীল তার পাঁচ আঙুল। যেন সে-মুহূর্তে তার সামনে আর অন্য কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী ত বেকার নয়। সে এত্তেলা দিলে।

—তুমি পার। খুব ঠেকা। তাই তোমার কাছে এত অনুরোধ। নচেৎ—

রাজপুরুষের জবাব দিতে বিলম্ব ঘটে। সময় যেন চোখ বুঁজে আছে, আদর-লোভী পুড্‌লের তৎকালীন চোখের মতো।

কিন্তু উত্তর শেষ পর্যন্ত দিতে হয়। 'আমার পালটা অনুরোধ। উজানী ট্রেডার্স নিয়ে তুমি আমাকে আর কিছু বোলো না।' হাজার হাজার অসোয়াস্তি রাজপুরুষ গলা থেকে নিমিষে উগরে দিলে।

তারপর স্তব্ধতা পৃথিবীময়।

কিন্তু সহপাঠী নাছোড়বান্দা। সে বেশ শান্ত এবং জোরালো কণ্ঠে বললে, 'ওল্ড ফ্রেণ্ড তুমি। আমি সব তাস খুলে ধরছি তোমার সামনে। তুমি আমার জন্যে একটা কিছু করবে— এই আশায়।'

—আমি—! রাজপুরুষ যেন ককিয়ে উঠল।

এই 'ডীল' যদি হয়, পার্টি বিশ হাজার টাকা খরচে রাজি। আমি ভেবে রেখেছি, আমার দিন-গুজরানের জন্যে পাঁচ হাজার রেখে দেব। বাকি পনেরো হাজার তোমার। এখন তুমি ভেবে দেখো। সহপাঠীর কণ্ঠস্বর আগের মতো শান্ত এবং জোরালো।

বক্তা চলে গিয়েছিল। সেদিন আর কোনো কথা হয় নি।

রাজপুরুষ ধাক্কা খেয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা একসঙ্গে রোজগার? বিনা মেহনতে! পৃথিবীতে এইজাতীয় ব্যাপার ঘটে সে শুনেছে, পড়েছে।

কিন্তু এমন চাক্ষুষ দেখে নি। দেখার ত কিছু বাকি নেই। বাকি স্রেফ একটা 'নড'। বাকি স্রেফ সম্মতিসূচক ঈষৎ শিরোভঙ্গি।

দেওয়ালের কান থাকে। শত শত পোস্টার দেখেছিল রাজপুরুষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। লোকের কানাঘুষা ত থামবে না। পেছন থেকে মন্তব্য চলবে, সামনাসামনি না হোক। অধস্তন সহকর্মীরা কি ভাববে? তাদের ইঙ্গিতময় চোখ-ঠারাঠারি রাজপুরুষ তখনই দেখতে পেলে।

সহপাঠী এক ধন্দে ফেলে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা রেহাই নেই হাতছানি থেকে। পনেরো হাজার টাকা? মানে অনেক কিছু। সাহিত্য-রসের প্রতি রাজপুরুষের তেমন আকর্ষণ ছিল না কোনোদিন। তাই বলে কল্পনার দৌড় থেমে রইল না। পার্থিব কত সুখের হাতছানি সঙ্গে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বহু ধরণের নিরাপত্তা আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কৃতিত্ব ব্যক্তিত্বের পরিধি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক দূর ঠেলে দেয়। অন্যদিকে—আপিসের মধ্যে কানাঘুষা এবং হঠাৎ ব্যক্তিত্বের ওজন-চুপসানো কৃত্রিম ভার নিয়ে দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কশাঘাত। বহু মানুষের সামনে ছোটো হওয়া কি বিধেয়?

এক কথায়, আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত রাজপুরুষ।

কয়েক দিনের মধ্যে এবং তা দৈব ব্যাপার বলা চলে, রাজপুরুষ হঠাৎ কূল পেয়ে গেল।

হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই ছুটির ঘণ্টা দুই আগে সে বাড়িতে ফিরেছিল। রাজপুরুষের পিতা ছিলেন গোছালো সংসারী মানুষ। ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদা-উৎকণ্ঠিত। রাজপুরুষের বর্তমান বাড়ি পৈতৃক-সূত্রে পাওয়া। উপর নীচে চার-কামরার দোতলা। নীচে ডাইনিঙ রুম। অপর কামরা ভৃত্যাধীন। উপরে বেড-রুম। অন্য কক্ষ ড্রয়িংরুম। এখনও বাড়িতে কোন ছেলেপুলে আসে নি। সুতরাং প্রশস্ত বাসভূমি।

কড়া নাড়তে কিশোর ভৃত্য দরজা খুলে দিয়েছিল। রাজপুরুষ হনহন করে উপরে উঠে যায়। সিঁড়ি থেকেই তার চোখে পড়ল বেডরুমের দরজা ঈষৎ খোলা। অথচ এই সময়ে বন্ধ থাকার কথা। বাড়িতে কেউ এলে তা জানালা দিয়ে দেখার বন্দোবস্ত আছে। সেই অনুযায়ী উপরের দরজা খোলা হয়। একা-একা থাকার ঝামেলা অনেক। স্ত্রী রাজপুরুষের চেয়ে সেদিক থেকে ঢের বেশী হুঁশিয়ার। দরজার পাল্লা ঈষৎ খোলা দেখে আশঙ্কিত, কৌতূহলী; সন্দিগ্ধ রাজপুরুষ সন্তর্পণে অকুস্থলের দিকে এগিয়ে

গেল। তিন-চার ইঞ্চি ফাঁক দুই পাল্লার মধ্যে। রাজপুরুষ দু-চোখ দূরবীন বানিয়ে নিলে। লঙশটে ধরা পড়ল — গৃহিণী একদম বিবস্ত্র। দিগম্বরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে চিরুনি। শাড়ির স্তূপ খাটের উপর। পাশে উবু বসে আছে কালো পুডল্, তার সারমেয়-দৃষ্টি নিয়ে মনিবের দিকে। চুলে চিরুনি চালানোর কালে মাঝে-মাঝে কুকুরের দিকে চেয়ে দিগম্বরী মুচকি হেসে আবার নিজেকে ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে সোপরদ্দ করছিল। রাজপুরুষ হতভম্ব। নীরব দর্শক। ফোকাসের উপর অবিচল দৃষ্টি। এক সময় সেও মুচকি হেসে ফেলে। এমন দিগম্বরী সে দিনে কখনও দেখে নি। এক সময় ধৈর্য-টলমল রাজপুরুষ দ্রুত পাল্লা ঠেলে হেঁকে ওঠে 'আ রে, এ কী ? ? !'

সহধর্মিণী প্রায় আঁতকে উঠেছিল কোনো আততায়ীর আশঙ্কায়। কিন্তু ঝটিতি নিজেকে সামলে নেওয়ার পূর্বে শাড়ির স্তূপ সামলাতে থাকে এক কোণে সরে এবং মুখ খোলে, "এ-ই তুমি। এমন হঠাৎ অসময়ে—"।

—দরজা খুলে রেখে—এসব কী খেয়াল চেগেছিল-? অন্য জনের প্রশ্ন।

—দরজার কথা খেয়াল ছিল না। গৃহিণী তখন দ্রুত বসনের তলায় প্রবেশার্থী। আরো যোগ করলে,—তুমি বুঝি আড়ি পেতে দেখছিলে ?

—দরজা খোলা। চোরের ভয়। বদমাশের ভয়—।

—বদমাশের ভয় নেই। এক তুমি ছাড়া। আর—। বাক্য অসমাপ্ত। সহধর্মিণী এবার হেসে উঠল স্বামীর দিকে চোরা চাউনি হেনে।

—কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার সাধ কেন ? রাজপুরুষের গলার আওয়াজ তরল হয় না।

—মানুষের কখন কী খেয়াল হয় তার বাঁধাধরা কোনো আইন আছে নাকি ? প্রায়-সংযত-বসন স্ত্রী মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল।

—কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার বাসনা কেন ? রাজপুরুষ অস্বাভাবিকতা মেনে নিতে পারছিল না।

গৃহিণী এবার গলায় কিঞ্চিৎ ঝাল মিশিয়ে নিলে,—কী ঘাট হয়েছে তাতে শুনি ? বিবস্ত্র হয়েছি তো কুকুরের সামনে। মানুষের সামনে ত না। ইতিমধ্যে পূর্ণ সংবত বসন স্ত্রী স্বামীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং আপ্ত-কণ্ঠে বলে,—কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে হলে ঘোর অপরাধ। বুঝেছেন, মিস্টার ?

কৌতুক-দৃষ্টি আবার নিক্ষিপ্ত।
রাজপুরুষ হঠাৎ সঙ্গিনীকে আলিঙ্গনে বাঁধে। এবং একটু পরেই পাশ খানিক শিথিল করে বলে—আগে হাতে হাত মেলাও। তারপর স্ত্রীকে একদম আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিষ্কৃতি দেয় সামনাসামনি ঈষৎ তফাতে ঠেলে।
—হাত মেলাব ? আমি ?
—হ্যাঁ, তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ। রাজপুরুষ স্ত্রীর উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি অনুরোধ প্রসারিত রাখে "বাকিটা আবার উচ্চারণ করো।" বিস্মিত সহধর্মিণী ধীরে ধীরে বলতে থাকে পুনরায়, "কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে অবিশ্যি অপরাধ।"
তারপর উভয়ের হাতের ঝাঁকুনি আর সহজে থামে না।

সহপাঠী পরদিন হাজির হয়েছিল। একবার দুপুরে আপিসে, আবার সন্ধ্যায় বাড়িতে, ঘোড়েল ব্যক্তি। অনভ্যাসের ভয় থাকে। সহপাঠী হিম্মত জুগিয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা ত নস্যি। যে-কোনো অফিসারের ঘর থেকে বেরুতে পারে। রাজপুরুষের ভয়টা কোথায় ? সে ধনীর সন্তান। তার স্ত্রী ধনীর দুলালী। উপরন্তু চাকরি চার বছরের পনেরো হাজারের হিসেব দিতে হবে নাকি ? যদি ফেউ লাগে। দুর্নীতি-দমন বিভাগের কেউ ? সই-করা-নোট-যোগে যদি ফাঁসিয়ে দেয়। পুরাতন সহপাঠীকে অবিশ্বাস ? সে নিজে ট্যাকসি করে এসে পাওনা মিটিয়ে যাবে। সংকোচের কিছু নেই। আর নেহাত যদি রাজপুরুষ হতাশ করে উপরে ছুটতে হবে। কালেক্টর আছে। সবার উপরে বোর্ড-অব-রেভেন্যু —রাজস্ব বোর্ড আছে। তখন খরচ হয়ত বেশি। কিন্তু তার পনেরো হাজার—আর থাকল না। অত টাকা কি বানে ভেসে আসে ? লোক-নিন্দার ভয় ? কিন্তু লোক কোথায় ?
কুকুরের সামনে বিবস্ত্র হওয়া অপরাধ নয়।
পরবর্তী অধ্যায়।
সহপাঠী জিতে গেল।

তবু কাহিনীর সামান্য জের আছে। তা-ই পরিশেষে বিবৃত।
অন্ধকারে বিরাট মাঠে ভয় পেলে মানুষ গান ধরে। হিন্দু মন্ত্র জপে,

মুসলমান পড়ে দরুদ। দুই বাহনই জাগতিক কাজে জবর লাগে।
রাজপুরুষ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন সহপাঠীর সঙ্গে রাখী-বন্ধন হ'ল নতুন করে। কলেজ-জীবন আবার বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কত সন্ধ্যা অভিজাত হোটেলে কেটে গেল। রাজপুরুষ বীয়ার পান করে। সহপাঠী আরো কঠিন পদার্থে তৈরি। তার প্রয়োজন হয় আরো কড়া চোলাই। রাজপুরুষের গৃহিণী এ-সবের শরিক নয়। টাকা বাড়ির মধ্যে কোথাও ছিল। কিন্তু সে জানে না। রাজপুরুষ একদিন ভাবলে, গৃহিণীকে সুখ-সন্ধ্যার ভাগী করা উচিত। কপোত-কপোতীর সংসার। এক সন্ধ্যা ঘরে উনুন না জ্বালিয়ে বাইরে দুজনে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিতে পারে। খরচ বেশি। সেই টাকায় ঘরে আরো ভালো খাওয়া যায়। তার জন্যে অত ভাবনার কিছু নেই আর। সেদিন সহপাঠী অবিশ্যি বাদ থাকবে। তাকে ছাড়াই এক সন্ধ্যা নীড় ছেড়ে তারা বিবাগী ডানা মেলে দেবে। সেদিন আপিস থেকে ফেরার সময় রাজপুরুষ এক শিশি দামি পারফিউম কিনে ফেললে স্ত্রীর জন্যে। পরবর্তী সন্ধ্যার পরিকল্পনা বাড়ি গিয়ে করা যাবে। কোথাও ক্যাবারে নাচ দেখা যেতে পারে। না, একদম অদ্দূর লাফ দিলে গৃহিণী সন্দেহ করবে। তার চেয়ে কোনো অভিজাত হোটেলে দামি ভোজনই উত্তম।

পরদিন সকাল। ছুটির দিন। একটু দেরিতে দম্পতি চা খেতে বসেছিল। রোববার কি ছুটির দিন তারা নীচে ডাইনিংরুমে চা খেতে যায় না। উপরে ভৃত্য ট্রলিযোগে সাজিয়ে আনে। আহার্য-তালিকা অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু লম্বা হয়। ভোজনে ব্যস্ততা থাকে না। ছুটির দিন। খ্রীষ্টান ঈশ্বরের মতো সবাই বিশ্রামার্থী।

কেটলি থেকে রাজপুরুষ চা ঢালছিল। ছুটির দিন রুটিন উলটে যায়। গৃহিণী যেন সম্রাজ্ঞী। হুকুম-তামিলের ভার মিস্টারের উপর।
রাজপুরুষ প্রস্তাব উত্থাপন করলে—আজ সন্ধ্যায় বাইরে খেলে কেমন হয়?
—খুব ভালো। একঘেয়েমিও কাটে।
—গুড।
—কিন্তু খরচ?
—একবেলার লাট। কত আর যাবে?
—তোমার হিসেব তুমি বোঝ গে।

—তুমি প্রচণ্ড বাক্-পটীয়সী।
—সার্টিফিকেট দিচ্ছ?
—না।
—নমুনা কোথা পেলে?
—প্রতিদিন পাই। তবে সেদিন একটা কথা বলেছিলে বটে!
রাজপুরুষ এই সময় চায়ের কাপ স্ত্রীর হাতে তুলে দিলে। অন্য কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললে—সেদিনের বাণীমন্ত্র আবার শোনাও।
—কোন দিনের?
—সেই দিগম্বরী অপরাহ্ণের। রাজপুরুষ স্মিত হাসির জের কক্ষময় ছড়িয়ে দিলে।
—যাঃ! অপর পক্ষ তাচ্ছিল্যতায় সব উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।
— একবার বলো না। রাজপুরুষ গলায় মিনতি মাখায়।
সংকোচে আড়ষ্ট গৃহিণী প্রথমে আঁচল দিয়ে ঠোঁটের হাসি আড়াল করে। এবং হঠাৎ আঁচল সরিয়ে গড়গড় করে বেশ জোরেই বলে ফেলে—কুকুরের কাছে ন্যাংটো হওয়া যায়, মানুষের কাছে না।
রাজপুরুষ অতি আনন্দিত, উৎসাহিত মন্তব্য যোগ করে—দামী কথা। দামী মন্ত্র।
স্ত্রী স্বামীর চোখে চোখ ফেলে বলে—স্যার, কথার আর একটু বাকী থেকে গেছে।
—বলো, বলো। স্বামীর যেন তর সয় না।
—কুকুরের সামনে কুকুর নিশ্চিন্তে ন্যাংটো থাকে।
এটুকু উচ্চারণের পর স্ত্রী খিক খিক হাসি আরম্ভ করে।
— ও—। প্রলম্বিত এই স্বরবর্ণের উপর রাজপুরুষ গোটা বাক্যের মর্মার্থ উপলব্ধির চেষ্টা করতে লাগল সেই নির্বিবাদ ছুটির সকালে।

পশুর নিকট উলঙ্গ থাকতে মানুষের কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।
এক পশু বেমালুম ন্যাংটো থাকে অন্য পশু-সমীপে।

গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া

ডাক্তার দোস্ত মোহাম্মদের ডিস্‌পেন্‌সারিতে আড্ডা তুমুল জমে উঠেছিল। প্রৌঢ় জন। রোজ পাঁচটার বেশী রোগী দেখেন না। তারপর অঢেল সময়। দংগল-প্রিয় মানুষ তাই লোক জুটত নানা কিসিমের। আসর আদৌ ফাঁকা যেত না।

সেদিন প্রসঙ্গ এ-ঘাট সে-ঘাট করে শেষে এসে নোঙর করেছিল সৎ-অসতের কূলে।

দোস্ত্‌ মোহাম্মদ তর্ক করতেও ভালবাসেন। তাই গিঠ সহজে খোলে না কোনদিন।

সেদিন এক ইঞ্জিনিয়ার ছিল আসরে। বয়স চল্লিশ নয়। তাঁর মতে নৈতিকতা টাইম বা কালের ব্যাপার। তাই এক যুগের হারাম অন্য যুগে হালাল হয়ে যায়। নৈতিকতার বাঁধা-ধরা গৎ নেই। যুক্তিস্বরূপ সে খাড়া করলো "আধুনিক ঢাকা শহরের হালচালের কথা।"

'আমি বলছি, মন দিয়ে শোনেন এবং লক্ষ্য করুন," ইঞ্জিনিয়ার অনেক বহসের পর বেশ তেতো কথা ছুঁড়ছিল, "তিরিশ বছর আগে মেয়েরা স্কুলে যেতো বোরখা পরে রিক্‌শায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে। দরজা থেকে নামার সময় কোন ফাঁকা জায়গা, যথা উঠান পেরোতে গেলে আর এক দফা পর্দা টানানো হোত। বর্তমানে ঢাকা শহরে পেট-কাটা, পিঠ-কাটা, বগল-কাটা, পেটদর্শী ব্লাউস পরে মেয়েরা বিনা বোরখায় হেঁটে বেড়ায়। পূর্বেও শহরে মুসলমান ছিল, আজও আছে। কেউ আপত্তি করে না। আপত্তি থাকলেও মনে মনে চেপে রাখে। তার মানে কি? ঈমানের জোর গেছে কমে। অথবা, এমন আপত্তি তুলে প্রতিবাদ মিছিল করলে

হাস্যাস্পদ হতে হবে লোকের কাছে। সুতরাং, ভেতরে ভেতরে মেনে নাও। সুতরাং, ব্যাপারটা জমানা বা কালের ব্যাপার। তা বাদ দিয়ে সৎ-অসৎ, হারাম-হালালের প্রশ্ন তোলা খামখা।" ইঞ্জিনিয়ার দম নিতে লাগল বেশ জোরের সঙ্গে বক্তব্য পেশ করে।

আসরে ছিলেন এক শাশ্বত, সনাতন-পন্থী প্রৌঢ় স্কুল মাস্টার। রিটায়ার করেছেন। তিনি আগেই লা-জওয়াব। তর্কের মুখে যুঝে উঠতে না পেরে চুপ, গুম হয়ে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার দোস্ত্ মোহাম্মদের মতামত কিঞ্চিৎ আলাদা। তাঁর মতে, কাল বাদ দেওয়া যায় না। তবে বাদ যাবে ইহকাল। কিন্তু ইহকাল বাদ দিলে আর থাকে কী? সময়ের চেতনা ত অস্পষ্ট ব্যাপার। একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা ঘটে ব'লেই সময়ের অনুমান পাওয়া যায়। এখন ইহজগত বাদ দিলে ত সব নাকচ হয়ে যায়। ইহজগত আছে ব'লেই স্থানের চেতনা গড়ে ওঠে। স্থান নেই, কাল—সে কী রকম জগৎ?

ফয়সালা সহজে হয় না। ডাক্তার দোস্ত্ মোহাম্মদ যদি ধায় পূরবে ইঞ্জিনিয়ার পশ্চিমে। শেষে চিকিৎসক তুরূপ করে বসলেন। বললেন, "ইঞ্জিনিয়ার, আমি কেন ইহকাল বাদ দিতে এত তৎপর—তার সাফাই আগে শুনে নাও। জীবদ্দশায় আমি কাউকে দুর্জন-সুজন আখ্যা দিতে রাজী নই। তাই ইহকাল বাদ রাখতে চাই।"

ইঞ্জিনিয়ারও মস্ত বাঁড়। সে থামল না, "যদি জ্যান্ত অবস্থায় একজন সুনাম বা দুর্নাম না পায়, সমাজের কী দশা হবে? সৎ কাজের দিকে কেন লোক এগোবে? অথবা, দুর্জনকে আপনি কী দিয়ে ঠেকাবেন? লোকনিন্দা ত মানুষকে যথা-পথে রাখার একটা বড় অস্ত্র। তা আপনি নিশ্চয় মানেন।?"

"এইখানে আমার যতো আপত্তি। ফল খাওয়ার লোভে যে ব্যক্তি পুণ্যের কোন কাজ করে তাকে আমি ধার্মিক বলি না।" ডাক্তার পাল্টা দিলেন।

"কেন?"

"পরকালে শাস্তি এড়ানোর জন্যে যে ব্যক্তি ইহকালে পুণ্যের কাজ করে, সে ত তুখোড়, চালাক লোক, ধার্মিক নয়। যে ফলাফলের কথা চিন্তা না করে সৎ পথে থাকে সে-ই হচ্ছে আসল ধার্মিক।',

ইঞ্জিনিয়ার কথাটার হদিস ধরতে পারে না। সে যুক্তি খুঁজতে লাগল। কিন্তু দোস্ত্ মোহাম্মদ তাকে সুযোগ দিলেন না, অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অর্থাৎ বললেন, "ইঞ্জিনিয়ার ভাই, আমি তোমার জমানার

তাসিরের (প্রভাব) কথা উড়িয়ে দিচ্ছিনে। আমার খট্‌কা অন্য জায়গায়। একটা কাহিনী ধৈর্য ধরে শোনো। তাহলে সব খোলাসা হয়ে যাবে, আর বহসে যাওয়া লাগবে না। আমি কেন ইহকাল নাকচ করে দিচ্ছি বুঝতে পারবে। চা—।"

ডাক্তার একা নন, আরো ওই সমস্বরে আড্ডা গরম হয়ে উঠল। চায়ের নেশা আরো কয়েক জনের চেগে উঠেছিল, বিলক্ষণ বুঝা যায়।

সকলের সামনে পেয়ালা পৌঁছানো মাত্র দোস্ত্‌ মোহাম্মদ এক চুমুক পানীয় দ্রুত গলায় ওদিকে নামিয়ে বললেন,"লম্বা কাহিনী। বিস্তারিত আর একদিন কইব। একদিনেও হয়তো কুলানো যাবে না। আজ আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর জন্যে শুধু মোটা মোটা দাগে মোদ্দা সীমাটা দেখানো। এক কাহিনী, শত ফ্যাকড়া। কোথা থেকে শুরু করব, তা-ও এক ধন্দ। তবে ধৈর্য ধরে তোমরা শুনে যাও। কেউ ফুট্‌ কেটো না। বয়স হয়েছে। খেই হারিয়ে ফেললে আবার পাকড়ানো দায়।"

চায়ের কাপে চুমুকে চুমুকে আমরা সকলে অধীর। দোস্ত্‌ মোহাম্মদ বয়ানও ভাল দিতে জানেন। একবার কেশে গলা সাফের পর তিনি আরম্ভ করলেন।

মফস্বল শহরের প্রচুর সম্পদশালী জন আলী খান। অনেকে ভাবতে পারে মফস্বল শহরের ষ্ট্যান্‌ডার্ডে ধনী। তা নয়। ইচ্ছে করলেই সে পুরোপুরি শহরের বাসিন্দা হতে পারত। শহরেও একাধিক বাড়ী আছে। ভাড়ায় খাটে। শহরে গেলে আলী খান ওঠে হোটেলে। এমন বিত্তবান, অথচ কেন যে সে মফস্বল বাস তুলে দেয়নি, তা কেউ বলতে পারে না। জায়গার মায়া? স্থানীয় লোক নয় সে। সুতরাং এমন ধারণা অবান্তর।

একদিন সকালে শহরে হৈচৈ পড়ে গেল: আলী খান মারা গেছে। কাল সন্ধ্যায়ও সে ক্লাবে গিয়েছিল। কখন রাত্রে বাড়ী ফিরেছে, কেউ জানে না। তারপর সকালে আর ওঠেনি। বেলা দশটার পর বাড়ীর লোক দরজায় ধাক্কা দিল। অন্য দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরলে কাউকে না জাগিয়ে শুয়ে পড়ার জন্যে আলী খানের এক কামরা বরাদ্দ ছিল। তার চাবি আর কারো কাছে

থাকত না। সকলে তাই নিশ্চিন্তে ছিল। কিন্তু সাড়া শব্দ না পাওয়ার পর দরজা ভেঙ্গে দেখা গেল, আলী খান মরে পড়ে আছে। শরীরে জখম বা আঘাতের কোন চিহ্ন নেই।

ছোট মফস্বল শহরে খবর ছড়িয়ে পড়তে আর কতক্ষণ লাগে। তা-ছাড়া আলী খান ছিল ডজন খানেক কি তার চেয়ে আরো জনহিতকর, সংস্কৃতি-প্রসারণী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পেট্রন প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি। ভিড় জমে গেল উঠানে। রাজধানী থেকে সাংবাদিক উড়ে এলো, কেউ মটোরে। তিনচার দিন সব খান-বিষয়ক সংবাদে পত্র-পত্রিকা এবং চা-খানার আসর জম-জমাট। পুরাতন ও হালফিল কতো ফটো না বেরলো এ-কাগজে সে-কাগজে। তার সঙ্গে শোকসভা, শোকবাণী বা ঐ জাতীয় রকমারী মাল।

কিন্তু দিন পাঁচেক পরে শহরে একটা কানাঘুষা শুরু হোলো আলী খানের মৃত্যু নিয়ে। মৃত্যু নাকি অস্বাভাবিক। প্রথমে বাড়ীরই কারো সন্দেহ হয়। তারপর এক মুখ থেকে কথা আর এক কানে। তারপর এক কান, দু'কান, শত শত কান। মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তেমন লক্ষণ ত থাকবে? তাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পুরাতন এক চাকরাণী শুধু বাড়ী থেকে গায়েব। সে কাউকে না বলে চলে গেছে। গুজব তার উপর ভিত্তি করে দানা বেঁধে উঠল। শেষে পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। বুড়ী চাকরাণীর ঠাঁই-ঠিকানার হদিস কেউ রাখে নাকি? তাই ঢেউ সহজে থিতিয়ে গেল না।

আরো অনেক ঘটনা। আজ বাদ দাও। আর একদিন ডিটেল বলা যাবে।

দু'মাস পরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন আমার বন্ধু আলম চৌধুরী। পুলিশের ডিটেক্‌টিভ ব্রাঞ্চে কয়েক বছর কাটিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি নিজেই প্রাক্‌টিশ শুরু করেন। বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন। আল্লা তাঁর বেহস্ত নসীব করুন। বাকী ঘটনা আমার তার কাছেই শোনা। আমার সঙ্গে ওঁর হঠাৎ আলাপ। হ্যাঁ, দৈবাৎই বছর পঁয়ত্রিশ পূর্বে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব আর দৈবাৎ রইল না। সে-সব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চাকরীর সময় বন্ধুর নাম-ডাক প্রচুর হয়েছিল। অতি বিচক্ষণ লোক। পরিস্থিতি শুঁকেই তিনি আন্দাজ করতে পারতেন কোন দিককার

পানি কোন্ দিকে গড়াবে। দারুণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পেয়েছিলেন সাহস। শার্লক্ হোমসের মত ওঁর কাহিনী কেউ যদি লিখত। আমার ক্ষমতা থাকলে ছেড়ে দিতাম না। মোদ্দা কথা, আলী খানের কেস শেষে আলম চৌধুরীর কাছে এসে ঠেক্‌ল।

তিনি ইন্‌কোয়্যারী নানাভাবে শুরু করেছিলেন। মাস দুই গেল, সুরাহা হয় না। শক্ত কেস। এক মেড-সার্ভেন্ট হাওয়া হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন 'ক্লু' নেই। সুতোর খোঁট ধরে গোলক ধাঁধাঁর ভেতর ঢুকবে। কিন্তু সূত্র—সুতো ত দরকার। হয়রান আলম চৌধুরী। তার জিদও সাংঘাতিক। মক্কেলের ফিয়ের দিকে অত নজর ছিল না। কেস হাতে নিলে তাকে ভূতে পেয়ে বসত। গভীর চিন্তার নিকট তখন দাসখৎ লিখে দিতেন। রাত্রে ঠিক ঘুমোতে পারতেন না। সুঠাম স্বাস্থ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু আয়ু অল্প। অনিয়মে শরীর ক'দিন টেকে? আমার আগেই তাই টিকেট কেটে বসলেন। কিন্তু নিয়ৎগুণে বরকত। বাসনা-গুণে মাহাত্ম্যও এসে জোটে। আলম চৌধুরী প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা তাঁকে তরিয়ে দিল।

দোস্ত্ মোহাম্মদ এই সময় কথা থামিয়ে টেবিলের দেরাজের উপর ঝুঁকে এ-দেরাজ সে-দেরাজ টানেন। শেষে একটা ফাইল বের করলেন। ভেতরে কাগজ উল্টে উল্টে এক জায়গায় এসে থামলেন এবং বললেন, "আমি একটা চিঠি পড়ছি অনেক জায়গা বাদ-সাদ দিয়ে। তোমরা শুনে যাও, তাহলে হাল-হকিকৎ ধরতে কোন কষ্ট হবে না।"

তিনি পড়তে লাগলেন .....

প্রিয় আলম সাহেব,

অপরিচিত জনের চিঠি। তবু আমি আপনাকে অনেক দোয়া জানাই। বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়ো। দশ-বারো বছর বা কি আরো বেশী। তবুও সালাম জানাতে ইচ্ছে হয়। মাত্র ক'দিন আগে আপনার খবর পেয়েছি। তা-ও দৈবক্রমে। ঠিকানা যোগাড় করতেও সময় গেল। .....এটা ঠিক, আমি ছাড়া আলী খানের মৃত্যু রহস্য আর কেউ জানে না। আমাকে অন্যতম আসামী বলতে পারেন। আসামী ত সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু আমি দেব। তার পূর্বে আপনি আরো আসামীদের ধরুন।

কিছু খোঁজ আমি দিতে পারি। তাতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। আমাকে ধরবেন সব শেষে। আমি নিজেই ধরা দেব। ক'দিন আর বাঁচব? আমি নিজেকে আসামী রূপে জানিয়ে তবে দুনিয়া থেকে যেতে চাই। নচেৎ আমার আত্মা শান্তি পাবে না। আরো অনেকের যোগ-সাজসে আমি আলী খানকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছি। ব্যাপারটা সহজ হয়ে এসেছিল। আমি শুধু ওর নাকে একটা রুমাল ধরেছিলাম, যখন ঘুমের ঘোরে ও নিশ্বাস টানছিল। চাবি যোগাড় নিশ্চয় ফন্দীর ব্যাপার। আপনার মত বিচক্ষণ গোয়েন্দাকে আর কি ভেঙে বলব। আমি অপরের যোগ-সাজসে একজনকে যমালয়ে পাঠিয়েছি। সমাজের চোখে তা কুকর্ম, কসূর। আমার শাস্তি হওয়া দরকার। অবিশ্যি আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন, তা বিচারের ভার আপনাকে দিয়ে রাখলাম অনেক আগে থেকে। ···

·····আমার স্বামী ছিলেন কেরানী। বাপ-ও তা-ই। বড় শহরে খুব নীচু মধ্যবিত্ত। আমাদের স্বচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্যও তেমন প্রকট নয়। বাপের বংশে এক এক করে আজরাইল সব টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামীও হঠাৎ মারা গেলেন। তার মৃত্যুর বছর খানেক আগে থেকে আলী খান আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছিল। কলেজের ছেলে। থাকার জায়গার অভাব। তাই স্বামী ওকে জায়গা দিয়েছিলেন। আহার বাবদ মাসে মাসে ও আমাদের কিছু টাকা দিত। ভাড়াটে ঘরে বাস। তবে সেকালে অল্প ভাড়ায় তিন কামরা বাড়ী পাওয়া যেত। স্বামীর মৃত্যুর পর অকূল পাথারে পড়লাম। গলায় কাঁটা এক পোনর-ষোল বছরের মেয়ে। তবে দিন চলে যেত। তা যাওয়ার মত সংস্থান আমাদের ছিল। স্বামী খুব চাপা মানুষ ছিলেন। কায়ক্লেশে টাকা জমাতেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু গহনাপাতিও তৈরী করেছিলেন আমার জন্যে। আলী খানকে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। বিশ্বাসী কাউকে পাওয়া দায়। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ ছিল না কেউ। সেদিক থেকেও আলী আমাদের খুব বড় সহায়।···

·····একদিন সকালে উঠে দেখি, আলী আর আমার মেয়ে দু'জনেই নেই। বোধ হয়, দু'জনে বেড়াতে গিয়ে থাকবে। পর্দাবিরোধী ছিলেন না স্বামী। তবে কড়া পর্দাও তিনি পছন্দ করতেন না। জোর করে আমার লজ্জা ভাঙান। আলী খানের সঙ্গে মেলামেশায় মেয়েকে আমি বারণ

করতাম না। তবে অবাধ মেলামেশার স্তর পর্যন্ত না যায়, সেদিকেও আমার চোখ ছিল। আমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল, যখন দেখলাম আমার গহনার বাক্স ভাঙ্গা এবং স্বামীর জমানো টাকা সব উধাও। জামাই ত ঘরেই বাঁধা ছিল। মনে মনে এই আশা পোষণ করতাম। কিন্তু মেয়েটা জওয়ানীর কি নেশায় ডুবেছিল, আল্লা জানেন। ··· গাঁয়ে হলে টেকা দায় হোতো। শহরে অত অসুবিধে ছিল না।····· ওই পাড়া ছেড়ে দিলাম। বাসা ভাড়ার আর সামর্থ কোথায়?

তিরিশ-তিন তেত্রিশ বছরের লম্বা কাহিনী। মুখ্‌তেসার কিছু শুনে রাখুন। আত্মঘাতী হয় মানুষ অমন ক্ষেত্রে পড়ে। না তা করলাম না। অবস্থার মোকাবিলায় দাঁড়ালাম। বিবি থেকে বাঁদী হতে কে চায়? তবু ধাপে ধাপে নেমে গেলাম। তাই বেঁচে গেলাম। প্রতিহিংসার পোকাগুলো আমাকে রোজ কুরে কুরে খেত—যদিও তখন সামনে কোন রাস্তা দেখতাম না। ভাবতাম, মৃত্যুর আগে আমার যন্ত্রণা নিভবে না।·····

···কিন্তু নেভার সুযোগ মিলে গেল। সবই দৈবক্রম। তখন মেয়েটার কোন হদিস পেলে আমি হাসি মুখে মরতে পারতাম। ডিটেক্‌টিভ সাহেব, আমার এক মুখে আর ক'টা কথা বলব? বাপ বাড়ীতে বই পত্রিকা আনতেন। স্বামীরও সেই অভ্যাস ছিল। স্কুলে মক্‌তবে দু'তিন বছর গিয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম শুধু নিজের চেষ্টায়। তা-ও মাঝে মাঝে ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমি পুরোপুরি বাঁদী। এক বাড়ীতে ছোট ছেলে ভুল পড়ছিল। আমি শব্দটি শুধরে দেওয়ার সময় বিবি সাহেব এসে পড়ে, শুধায়, তুমি লেখাপড়া জানো নাকি? না, মা। ছেলেবেলায় এক মৌলবী সাহেবের কাছে পড়েছিলাম কিছুদিন। হগ্‌গল ভুইল্যা গেছিগ্যা। হড়াৎ হড়াৎ এক আধটা কথা মনে উড়ে যায়। সেই থেকে আরো সাবধান হতাম। মিয়াগো বাড়ীৎ·····

·····তিরিশ বছরের লম্বা পাড়ি। তিন বছর আগে হঠাৎ আলী খানকে এক বাড়ীতে দেখলাম। পার্টি দিয়েছিল সাহেব। আমি ওকে চিনে ফেলেছি একবার দেখা মাত্র। ও আমাকে চিনবে কী করে? কৃচ্ছতায় কৃচ্ছতায় বাঁদীর ছিরি। বয়স ত অটল থাকে না। অবিশ্যি ওই বাড়ীতে আলী খানের যাতায়াত ছিল ঘন ঘন। আমি এক ফরমাস পালন ছাড়া ওর সাম্‌নাসামনি হতাম না। তা-ও কাচু-মাচু, মুখ নীচু।···জীবনে কত

টেবিল না দেখলাম। তার উপর নানা রকমের খাবার। পেরথম পেরথম লোভ হোত। শেষে অভ্যেসও মানুষকে নির্লোভ করে ফেলে। আঙ্গুর ফল টক হয়ে যায়। অবস্থার গুণে সব বদলায়·····আলী খান আমাকে চিনতে পারেনি। সাদা চুল, ভাঙা গাল, ময়লা শাড়ী, বুড়ির দিকে জওয়ানেরা ঘন ঘন চাইবেন কোন দুঃখে? ওর বাড়ীতে চাকরী পাওয়ারও আর এক লম্বা কাহিনী আছে। আজ নাইবা শুনলেন। ওই বাড়ীতে স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছতায় দু'বছরে শরীর আরো কাহিল করে ফেললাম। আমাকে চেনার কোন যো রাখলাম না। কিন্তু বুকের জ্বলন্ত দোজখ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জীবনে বাঁচার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম। তাই কৃচ্ছতা তেমন কাবু করতে পারত না।···

·····আজ সংক্ষেপে আপনাকে জানিয়ে রাখি: মুখোশ পরতে শিখেছিল আলী খান সেই বয়সে। এই মুখোসই তাকে সমাজের কেউ-কেটা বানিয়ে দিয়েছে। ওর দান ধ্যান, জনহিতকর কাজ সবই মুখোস। সব রাজনৈতিক পার্টিতে চাঁদা দিত আলী খান, কিন্তু নিজে রাজনীতি করত না। ফায়দা ওঠাত সব জায়গা থেকে। মুখোশের রাজা বলা যায় ওকে. এক কথায়। ইলেক্‌শানের পূর্বে অনেক-কে কী আপনি দাড়ী রাখতে দেখেননি ভোট যোগাড়ের জন্যে? যাক. সে কথা। আমি বদ্‌মাস্‌টাকে দুনিয়া থেকে সরাতে পেরেছি। আল্লা হিল্লে মিলিয়ে দিলেন। কিন্তু ও ত একা নয়। ওরা একটা গ্যাং। আরো বহু বদ্‌মাস আছে। ইঁদুরের গর্ত থেকে বহু সাপ বেরুবে। আপনি জানেন, ডাকাত যখন হিস্যা ভাগ বাঁটোয়ারায় বসে তখন আর ডাকাত থাকে না।·····

····· ছিঁচকে চোর ব'নে যায়। ডাকাতের ইজ্জত আছে। কিন্তু চোর ত ওঁচা, নিকৃষ্ট। লোভে মানুষ দস্যু হয়। লোভই তাকে আবার চোর বানিয়ে তোলে। এই জন্যে ওরা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। আল্লা আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। আপনি গ্যাং ধরুন। তখন আরো বুঝতে পারবেন। আপাততঃ আমি আপনাকে একটা সূত্র দিয়ে দিচ্ছি। 'চ' শহরে হোটেল দীল্‌-মোরিয়া'-য় শনিবার লাঞ্চ খেতে যায় এক বঙ্গদেশী সাহেব। লম্বা চওড়া কদ্, শ্যামবর্ণ, বেশ ঝুপো গোঁপ। তার দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু, শেষে উপরের দিকে উঁচানো। সদা ফিট্‌ফাট। চোখে সান-গ্লাস থাকে। শীতকালে সর্বদা জনসমক্ষে স্যুট পরে চলা-ফেরা করে, বাহারে টাই-সহ। এই

মূর্খ বাঁদীকেও একদিন হোটেল দীল্‌মোরিয়ায় যেতে হয়েছিল এক কামরায় সলা-পাকানো'র জন্যে। আমাকে ওরা নিরেট মূর্খ ভেবেছিল। সুতরাং এত চীজ আমার চোখে পড়বে আর আমি ওদের ইংরেজী বাক্যের টুটা-ফুটা ধরতে পারব—তা ওদের কল্পনায় ছিল না।·· আপনি কাজ শুরু করুন, আল্লা আপনার কামিয়াবী (সাফল্য) দেবেন। শুধু মেয়েটার একটা খোঁজ পেতাম। জওয়ান কালের নেশায় মেয়েটা কেন যে এমন ভুল করে বসল, ভেবে পাইনে। আলী খানের বিবি বাচ্চাদের ত সব চিনি। যদি মেয়ে-টাকে রক্ষিতা করেও কোথাও রেখে থাকে··
আল্লা ডিটেক্‌টিভ আলম চৌধুরীর হায়াৎ (আয়ু) দরাজ করুন, তাঁকে কামি-য়াব করুন।

ইতি,
মেড সার্ভেন্ট

পুনঃ—আমার খোঁজে আপনি সময় নষ্ট করবেন না। একদিন আপনার কাছে এসে হাজিরা দেব। আপনি মুখোস ছেঁড়ার কাজে—দেরী করবেন না, এগিয়ে যান। সত্য আপনার সহায়।

দোস্ত্‌ মোহাম্মদ আমাদের দিকে না তাকিয়ে দেরাজ খুলে ফাইলটা রাখতে রাখতে ব'লে যান, 'ইঞ্জিনিয়ার তোমার টাইম, কাল-পরিবেশ আমি অস্বীকার করছিনে—।" এমন সময় দেরাজ বন্ধ করার কটু ঘষা শব্দ ওঠে। তারপরই ডাক্তার আমাদের দিকে সোজাসুজি মুখ ফিরিয়ে সম্বোধন করেন, 'ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাপিয়ারেন্স ইজ নট রিয়্যালিটি। বাহ্য-রূপই বাস্তবতা নয়। জেনে রাখো ভাল করে, আলী খান ইজ এ স্কাউণ্ড্রেল, এ্যাণ্ড নাম্বার ওয়ান।"

"স্কাউণ্ড্রেল!" ইঞ্জিনিয়ারের জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি দোস্ত্‌ মোহাম্মদের মুখের উপর।
"হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু স্কাউণ্ড্রেল নয়। আমার বন্ধু মরহুম আলম চৌধুরী ওই কেসে একটা পুরো গ্যাং ধরেছিলেন। সব চীট, স্কাউণ্ড্রেল, লম্পট পরোক্ষ মার্ডারার খুনীর দংগল। আলী খানের বিধবাকে ঠকিয়ে বিস্‌মিল্লা

—না, ঠকিয়ে কেন, বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতক, ট্রেটর। অথচ এই বিশ্বাসঘাতক সমাজকর্মী দানবীর আরো কতো শত সদগুণের টাইটেল না নিয়ে মরল। ইঞ্জিনিয়ার—।"

দীর্ঘ সম্বোধন। প্রকৌশলী সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে ওঠে, 'জী ডক্টর সাহেব।"

"ইঞ্জিনিয়ার, ইমিডিয়েট প্রেজেন্ট্, তাৎক্ষণিক বর্তমান ত কাল পরিসরে কিছু নয়। কালের পরিসর মানে ইতিহাস। ইতিহাস সব খুলে ধরে। সব খুলে ধরে: কে লেবাসধারী, কে ল্যাংটা—কে সত্য, কে মিথ্যে—কে ভণ্ড, কে সাধু। অথচ আলী খানের মত বাস্টার্ড্ বিশ্বাসঘাতক সম্মানের কী শিরোপা না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় উপর আমার মুতে দিতে ইচ্ছে করে।"

পরক্ষণে নিজের ক্ষুন্ন মর্যাদা এবং শব্দের অশালীনতা শুধ্রাতে ডাক্তার ফের বলেন, "আমি এস্তেঞ্জা করে দিতে চাই।"

প্রৌঢ় স্কুলমাষ্টার এবার মুখ খোলেন, 'ডাক্তার সাহেব—।"

কিন্তু চিকিৎসক তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে যায়, "ভাই, একটা বড় গ্যাংয়ের ব্যাপার। এক আধটু শুনে কী হবে? আগে কথা উঠলে ভাল ছিল। এখন রাত হয়ে গেছে। আর এক দফা চা ? ? ? ? ?"।

ডাক্তার সাহেব আমাদের দিকে তাকান পালাক্রমে।

সকলের প্রত্যাখ্যানের পর আমরা, ডাক্তার ত বটেই, সবাই উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় স্কুলমাস্টার আবার খেই ধরেন, 'ডাক্তার সাহেব, মেড সার্ভেন্টটার কী হোল ?"

"আর একদিন বলব পুরো কাহিনী। তবে আপনার কৌতূহল মিটছে না। তাই সংক্ষেপে শুনে রাখুন। বুড়ি মেড-সার্ভেন্ট্ আহা বেচারা। বয়সের ভারে শরীর চুল একদম পাকা শন। কিন্তু স্মৃতিশক্তি মাশাআল্লাহ প্রখরভাবে খাড়া। এজহার দিলেন দু'দিন ধরে। জেরার সময় জানতে পারলেন আলী খান দলের লোক দিয়ে তার মেয়েটাকে খুন—মার্ডার করিয়েছিল। শোনামাত্র বৃদ্ধা কোর্টেই হার্টফেল করে মারা যান।"

মুষ্টিযুদ্ধ লঘুনৃত্য

১.

পঁচিশ বৎসর পরে এই গল্প-বলার সুযোগ পেলাম।
তার আগে আমি এহেন কর্ম করতে পারতাম না। কারণ কসম খেয়েছিলাম। আমাকে দিব্যি কাটতে হয়েছিল নায়কের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরই শুধু এই রিপোর্ট আমি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারি। অবিশ্যি ঘটনা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার। সময় আন্দাজ ইংরেজী সন ১৯২০ কী ১৯২১।
কথাটা আরো খোলসা করতে হয়।
এখন আমি পেশায় কলী-সরবরাহের ঠিকাদার। কিন্তু জীবন শুরু করেছিলাম, সাংবাদিক হিসেবে, ক্রীড়া বিভাগের সংবাদদাতা বা আপনারা যাকে হালফিল ভাষায় বলেন, স্পোর্টস্ রিপোর্টার। তখন স্টেডিয়ামের বালাই ছিল না। মাথার সূর্য্য ছাড়া আর কেউ ছাতা ধরত না—বলা বাহুল্য। চাষীদের মত রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে খেলা দেখতাম। ফুটবল, হকি। তখনও ভলীবলের রেওয়াজ হয় নি। পোলো খেলা হোত, রিপোর্ট হোত না। ইংরেজরা মাঠে গল্‌ফের প্রতিযোগিতা করত, বাংলা কাগজে তার গন্ধও যেত না। উপরন্তু রেসের ঘোড়ার খবরদারীর ভারও ছিল আমার উপর। শনিবার-শনিবার এই মহৎ কার্যে তখন ঢুঁ মারতাম। কুস্তি বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তবে তেমন জনপ্রিয় হয়নি।
কেন জানি না, ক্রীড়া বিভাগের এই দফাটুকু আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। বড় ফুটবল খেলা ছেড়ে, আমি গন্ধ পেলে সোজা দৌড়াতাম বক্সিং-এর রিঙের সীমানায়। ঘুষোঘুষি দেখার চেয়ে মজার কোন জিনিষ আছে

দুনিয়ায় আমি ভাবতে পারতাম না।

রিপোর্টার হিসাবে আমার কর্ম ছিল সকালে চা খাওয়ার সময় খেলার নোটীশগুলো দেখে নেওয়া। নিজের কাগজে যা যা দিই, তা জানাই আছে। অন্য কাগজে কী আছে তা-ও সংগ্রহ করা দরকার।

সেদিন আমি অবাক। এমন একটা খবর! অথচ আমি সংগ্রহ করতে পারলাম না? লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল। এক অখ্যাত কাগজের রিপোর্টার এই সংবাদ 'স্কুপ' করেছে অর্থাৎ দাঁও মেরে আগে বাগিয়েছে। রিপোর্টার হিসেবে ওর খ্যাতি চচ্চর বহু ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। পেশাগত হিংসের খোঁচায় সকালের চা তেতো হয়ে গেল।

উক্ত অখ্যাত কাগজে বড় বড় হেডিংয়ে বেরিয়েছে :

বিশ্বের সবচেয়ে আজব প্রতিযোগিতা—কবি বনাম কুস্তিগীর

এক দিকে বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে বিশ্ববিশ্রুত কুস্তিগীর গামা। কুস্তি নয় মুষ্টিযুদ্ধ।

স্থান : ভূচর জিম্‌নাসিয়াম ক্লাবের টিনঘেরা মাঠ। তারপর রিপোর্টার সংবাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে। "ভূচর জিম্‌নাসিয়াম ক্লাবের সদস্য-গণ চাঁদার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন। তিনি স্বল্প চাঁদা দান করেন। তখন সভ্যগণের কী যেন মন্তব্যের ফলে, কবি বলেন যে তার বেশী আর তাঁর দেওয়ার সাধ্য নাই। বেশী চাঁদা সংগ্রহের জন্য তিনি অবশ্যই তাহাদের সাহায্য করিবেন। তখন এক সদস্য প্রস্তাব করে, তিনি যদি কোন বিশ্ববিশ্রুত কুস্তিগীরের সহিত মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে যে পরিমাণ চাঁদা সংগ্রহ হইবে, তদ্বারা শুধু ভূচর ক্লাব কেন আরো বহু ক্লাব নব জীবন লাভ করিবে। কবি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হন। ভূচর ক্লাব পরে গামার সহিত যোগাযোগ করে। তিনিও রাজী হন। একদিকে বিশ্ববিশ্রুত কবি অন্যদিকে বিশ্ববিশ্রুত পাহাল্‌ওয়ান। এই প্রতিযোগিতা অভাবনীয় বৈকি। আগামী···· তারিখে এই মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি যে ওই টীনঘেরা মাঠটুকুর দিকে নিবদ্ধ থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই···।"

রিপোর্টার খুব রসিকতার সঙ্গে আরো ঘটনা পরিবেশন করেছিলেন। সে কথার দিকে আমার আদৌ মন ছিল না। কারণ, পূর্বেই বলেছি, পেশাদারী ঈর্ষা।

পুকুর ঘুলিয়ে ফেললে মাছের যে-দশা, আমার মনে হয়, শুধু শহর কেন গোটা পৃথিবীর তখন সেই হালৎ। দুনিয়ার অন্যান্য ঘটনা এই প্রতিযোগিতার মুখে থিতিয়ে গিয়েছিল। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক হাজার হাজার মাইল পার হয়ে এসে পৌঁছাল। শহরে হোটেলে ঠাঁই পাওয়া দায়। আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলা কোন পরিবারকে না সহ্য করতে হয়েছে? শহরের লোকসংখ্যা ক'দিন থেকে বেড়ে গেল। দুনিয়ার এ আজব তামাশা কার না দেখার সখ? যারা বঞ্চিতের দলে, তারা ভাবল এই জন্মই বৃথা। ভূচর ক্লাবের মাঠে ত জায়গা কুলাবে না। তাই পৌরসভা পর্যন্ত এগিয়ে এল আরো বিরাট বেবহা মাঠ ছেড়ে দিতে যেন সহজে কেউ নিরাশ না হয়।

সাংবাদিক হিসেবে অবিশ্যি আমার ব্যক্তিগত কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, বন্ধুবান্ধবদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সুপারিশসহ এসে ছেঁকে ধরল—টিকেট দাও। আর সব বায়না ত দুনিয়া থেকে লোপ পেয়ে গেছে। টিকেট দাও, টিকেট দাও। শেষে ব্লাকমার্কেটে পাঁচ টাকার টিকেট পঞ্চাশে বিক্রী! তা-ও দুষ্প্রাপ্য! সেই সময়কার তুমুল উত্তেজনার আঁচ দেওয়া সত্যি অসম্ভব। গোটা পৃথিবী যেন তোলপাড় হোয়ে গেল, যা তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাযুদ্ধেও দেখা যায়নি।

অবিশ্যি এই সময় সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সভা, শুধু প্রতিবাদ সভা। রবীন্দ্র-ভক্তরা রীতিমত দেশময় আর এক প্রচার চালালো: মুষ্টিযুদ্ধ একটা বর্বরতা। বিশ্বের বিস্ময় এক প্রৌঢ় কবিকে এই ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া অন্যায়। কিন্তু তাদের মুখ বন্ধ করলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে বিবৃতি দিয়ে। তবু শত শত টেলিগ্রাম পৌঁছল কবির কাছে। সদ্য মেসোপোটেমিয়া-ফেরৎ হঠাৎ কবিযশে যশস্বী হাবিলদার কাজী নজরুলের কাছে একদল রবীন্দ্র-ভক্ত ধর্ণা দিলে, আপনিই কবিকে নিবৃত্ত করতে পারেন এই দুঃসাহসিক অভিযান থেকে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, পয়লা সারিতে বসে এই লড়াই দেখার জন্য আমি একশ' টাকার টিকেট কিনেছি। একটা বিবৃতিও দিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতার স্বপক্ষে। ভূচর জিমনাসিয়াম ক্লাবের সভ্যগণ কবি নজরুলকে তাই একটা কমপ্লিমেন্টারী সম্মানী টিকেট দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের টিকেট হারিয়ে ফেলেন। সেজন্যে তাঁর আফশোষের সীমা ছিল না। এমম্বিধ হাজার

ঘটনা টুক্‌রো প্রবাহে সেই ক'দিন মাৎ ছিল আজ সব স্মরণ মুশ্‌কিল, উপলব্ধি আরো কঠিন।

প্রতিযোগিতার তারিখে গোটা মহাদেশের বোধ হয় হুঁশগুশ ছিল না। টিকেট পেয়েও চার পাঁচ ঘন্টা আগে প্যাণ্ডেল বাঁধা মাঠের সামনে সবাই জড়ো। আগে থেকে বসে যাওয়াই ভাল। কখন কী হয় কে জানে। কেল্লা থেকে গোরা সিপাই পাঠিয়েছিল ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে তখনকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। দর্শকের দিক থেকে বলা যায়, গোটা পৃথিবী জড়ো হয়েছিল এই প্রতিযোগিতার মাঠে। সুদুর আফ্রিকা থেকে এসেছে নানা গোত্রের কাফ্রিদল। পেরুর এক অধিবাসীকে পর্যন্ত সেদিন দেখেছিলাম। চীন, জাপান—এসব পাঁদাড়, পাঁদাড় কা বাৎ। গোটা দুনিয়া এই আজব তামাসার শরীক। যারা টিকেট পায়নি, নিষ্ফল—হতাশের দল, সহস্র-সহস্র আশপাশে দাঁড়িয়ে বাইরের মজা লুটতে ব্যস্ত, নিরাশার হাঁপানি চেপে।

সাংবাদিকরা সেদিন ভাগ্যবান বলতে হয়। আমিও একদম রিঙের পাশে জায়গা পেয়েছিলাম। যদ্দুর ভালো রিপোর্ট করা যায়, তার জন্যে গোটা বদন-মন একদম টং। আজ দুঃখ হয়, সেই কাগজ উঠে গেছে, তার কপি পাওয়া যায় না আদৌ। নচেৎ সেই পরিবেশন আজ আস্ত তুলে দিতাম। আমার রিপোর্ট হোয়েছিল সব চেয়ে সেরা। আমাদের পত্রিকাকে সুনজরে দেখে না, এমন কাগজও পরে তারিফ জানিয়ে পত্র দিয়েছিল। আফশোষ, অগোছালো হওয়ার একটা সীমা থাকা উচিত। এমন একটা মূল্যবান দলীল হারিয়ে ফেললাম।

আজ তাই স্মৃতির উপর সব বরাদ্দ।

২.

রেফারী হুইশেল বাজিয়ে দিলে।

রিঙের মধ্যে দুই প্রতিযোগী হাজির। রবীন্দ্রনাথ পরেছেন সাদা হাফপ্যাণ্ট, পায়ে সাদা কেড্‌স জুতা। আদুল গা। বাবরী চুল ঈষৎ বিন্যস্ত। গোঁফের কোন শৃঙ্খলা-সাধন করেছেন, মনে হোল না। গামার বিরাট শরীর, নগ্ন ত বটেই, তার উপর কালো পরিপাটী লম্বা লম্বা গোঁফ দেখলে মনে হবে দৈত্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তারও গা খালি। পায়ে একই ধরনের কেড্‌স জুতা। পরনে খাকী হাফ্‌প্যাণ্ট। উভয়ের গ্লাভ্‌স বা দস্তানার

রঙ বাদামী। গামার পাশে রবি ঠাকুর-কে কিন্তু আদৌ বেখাপ্পা মনে হয় না। একজন দৈত্য আর এক জন ত তালপাতার সিপাই নয়। কেবল দেখা গেল রবি ঠাকুরের শরীরের তুলনায় পা সত্যি সরু। এই জন্যে শুনেছি তিনি পা আল্‌খেল্লা দিয়ে ঢেকে রাখতেন। আজ সরেজমীন দেখলাম।

এবার বক্সিং শুরু হবে। কিন্তু লাখ খানেক জন-সমাগমে থৈ থৈ প্যাণ্ডেলের পূর্ব পাশ থেকে চীৎকার শোনা গেল : গুরুদেব, এই দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত হন। হৈ চৈ আর থামে না। তখন রেফারী কি যেন বললেন কবি-কে। তিনি রিঙের কিনারায় সাদা দড়ীর উপর দস্তানা পরা হাত রেখে সম্বোধন করলেন, অতি মিহি গলায়, "বৎসগণ!" বিরাট শরীরে এমন চিকন স্বরের বাসা, সেদিন নিজ কানে শুনলাম।

কবি বললেন, "বৎসগণ, তোমরা শান্ত হও। দেখা যাচ্ছে, তোমরা আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও আমার বই তোমরা পড়ো না। জীবন স্মৃতি যদি পড়ে থাকো, খোঁজ পাবে বাবা-মশায়ের হুকুমে আমাদের খালি গায়ে ধুলোমাটীর উপর দারওয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতে হোত। সুতরাং আমি শরীর চর্চার সঙ্গে পরিচিত নই, তোমরা মনে জায়গা দিও না। এই লড়াই এক-তরফা হবে না, আমি তোমাদের আশ্বাস দিতে পারি। লড়াইকে ভয় পাও কেন? ঐ দ্যাখো এক লড়ুয়ে কবি—ও তলওয়ার দিয়ে দাঁড়ী চাঁচে, লড়াইকে ভয় পায় না।"

কবির আঙুল এবার পয়লা সারিতে উপবিষ্ট কাজী নজরুলের উপর নিবদ্ধ। সব দৃষ্টি সেই দিকে তখন ঝোঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু গোলমাল কিছু থামলেও একেবারে থামে না।

কবি তখন সম্বোধন করেন, "বোঝা যায় তোমরা আমার বই পড়ো না। আচ্ছা আমার গান ত শোনো? না তা-ও ফক্কা। একটা গান শোনো।"

কবি গান ধরলেন, "আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে আবার ভরেছ
নব নব।

আশা করি এই গানের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমার মধ্যে আরো কী

আছে তোমরা জান না। আজ দেখে যাও।"
গোটা প্যাণ্ডেল চুপ। এবার বক্সিং শুরু হবে। রেফারী দুই প্রতি-যোগীকে পরিচয় করিয়ে দেবে, কর ত আর নেই, গ্লাভস বা দাস্তানা-মর্দন মারফৎ।
তার আগে কবির কাছে চ্যাম্পিয়ন পাহালওয়ান এগিয়ে এসে বললে, "আপ হামকো পাহ্চান্তে ?"
কবি হেসে উঠে জবাব দিলেন, "এ পর্যন্ত শত শত গান লিখেছি। সারা জীবন সা—রে—গা—মা করলাম, আর গামা—কে চিনব না ?"
গামা হেসে উঠল। বললে, "আজ হামাকে আওর ভি চিন্বেন।"
রেফারী আর দেরী করতে নারাজ। দুই যোদ্ধার হ্যাণ্ডশেকের পর সে হুইশেল বাজিয়ে দিলে। ফাইট শুরু হোয়ে গেল।
আমি ত প্রথম মিনিটে একটা নক্-আউট এবং অঘটন দেখার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলাম। গামা কুস্তিগীর। পাঞ্জায় জোর কত। আজ না হয় মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু হাতের কুওত যাবে কোথায় ? একটা ঘুষি। ব্যস, কবি ত সর্ষে ফুল দেখবে নয়নে নয়নে অথবা আকাশ-চয়নে।
কিন্তু আমার ধারণা ভুল।
প্রৌঢ় কবির দিকে তাকাও। একদম পাক্কা মুষ্টিযোদ্ধা। ঠিক কায়দা-মত একটু ঝুঁকে লড়ছেন। বাম হাত দিয়ে আগল দিচ্ছেন। পায়ের ক্ষিপ্রতায় বিড়ালও হার মানে। ভড়কি দিতে গেল গামা। মুখের দিকে সোজা 'হুক' করতে গিয়ে পেটের দিকে ঘুষি চালালো। ওস্তাদ কবি। দুই হাত ঠিক পেটের উপর। তারপর সোজা ছোট লাফ দিয়ে একটু পেছিয়ে গেলেন। তখন গামা এগিয়ে গিয়ে বাম হাত চালালে ঠিক কবির মুখ বরাবর। ও আল্লাহ, এবার আর সামলাতে পারবেন না। কিন্তু কথার জহুরী, কৌশলেরও জহুরী। একদম পাকা বক্সারের মত কোমর থেকে দেহ এক দিকে হেলিয়ে দিলেন। ঘুষি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত প্যাণ্ডেল স্তব্ধ। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, কৌতূহল—সব কিছু মিলে একাকার। গোটা জনতা যেন এখন একদেহ। সজীব শুধু ওই তিন প্রাণী। রেফারী এবং দুই যোদ্ধা।
গামা বড় ঠেসে ধরেছে। রবি ঠাকুর পেছাতে পেছাতে একদম রিঙের এক কোণে পড়ে গেছেন আর রক্ষা নেই! ঠোকা ঘুষি চালাচ্ছে গামা

চিবুক বরাবর। একদম ভীষণ 'আপার কাট'। কবি চট করে হাঁটু মুড়ে গামার কোলে যেন সেঁধিয়ে গেলেন। তারপর কনুয়ে কনুই রেখে গামার দুই হাতের পেশীর উপর চাপ দিতে থাকেন। দক্ষ বক্সারের এই সব কায়দা, শত্রুকে হাল্লাক করে দেওয়ার কায়দা কবি ভাল মতই জানেন। এসব শিখলেন কোথা থেকে? বালক-কালের কথা কি এখনও মনে আছে?

রেফারী হুইশেল বাজিয়ে দিলে। প্রথম রাউণ্ড শেষ হোলো। আমরা হাফ ছাড়লাম। দেখলাম, কবি ঘামছেন, কিন্তু ক্লান্ত নন। রবীন্দ্র দল মনে মনে বোধ হয় দুর্গা জপছিল, সব চুপ। এক রাউণ্ড গামার সঙ্গে টেকাও ত এক মহা বিস্ময়।

সেকেণ্ড রাউণ্ড শুরু হয়ে গেল। আমরা উৎকণ্ঠিত, দেখা যাক কি হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লড়ছেন দক্ষতা-মাফিক, নিয়ম-মত। একবারও দেখবে না তিনি প্রতিপক্ষের বাম দিক দিয়ে ঘুরছেন। ভড়কি সামাল দিচ্ছেন একদম ঠাণ্ডা মাথায়। সুযোগ পেলে সোজা ঘুষি চালাচ্ছেন। তার পায়ের ক্ষিপ্রগতি দেখার মত। চিবুক একটু নীচে রেখে চমৎকার গার্ড রাখছেন নিজের দেহের উপর। কনুই পেটের কাছে এমন রাখা, ঘুষি যথাস্থানে পৌঁছায় না। একবার কাছে গিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ, চিবুক তখন বুকে ঠেকানো। গামা ঠিক কায়দায় আনতে পারছেন না। কিন্তু সেকেণ্ড রাউণ্ড শেষ হওয়ার আগে কবি একবার ভুল করে বসলেন। তিনি বাঁ দিক দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘুরতে গেলেন। তখন গামার একটা 'সুইং' ঘুষি এসে পড়ল চোয়ালের উপর। পুরোপুরি লাগল না কবির চোয়ালে। কিন্তু গামার ঘুষি ত। তিনি আর তাল সামলাতে পারলেন না। মুখ গুঁজে মঞ্চের উপর পড়ে গেলেন। গামা সিংহের মত ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকল ভূলুণ্ঠিত শিকারের দিকে চেয়ে।

রেফারীর গণনা শুরু করে। এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—।
ওদিকে প্যাণ্ডেলে রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে তখন মহরমী মাতম শুরু হয়ে গেছে। "হায় গুরুদেব, হায় গুরুদেব—এ্যাম্বুলেন্স এ্যাম্বুলেন্স—।" ইত্যাদি রব।

ছয়, সাত, আট। রেফারী গুণে চলছে। কবি সম্রাট তখন মঞ্চের উপর। তবে শরীর নড়ছে। দুই দস্তানার উপর তার মুখ। নাক ঘষছেন।

"নয়—", রেফারী হেঁকে উঠল।
রবীন্দ্রনাথ উঠছেন ধীরে ধীরে।
বিরাট হাততালির রব।

দশ গুণতে হলো না, আবার লড়াই শুরু করলেন। নিজে এক আধ ঘুষি খেয়েও এগোন। সর্বদা চঞ্চল। তিনি জানেন, চলন্ত জিনিষে আঘাত করা যায় না। কিন্তু কবি কিছু ক্লান্ত ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। কপালে ঘামের স্রোত। এই সময় কবির কৌশল প্রধানতঃ প্রতিপক্ষের ঘুষি ঠেকানোর জন্যে তার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তারপর তার হাতের পেশীর উপর চাপ দেন। আরো ক্লান্ত হোক প্রতিপক্ষ। ঠিক এই রকম অবস্থায় তিনি হঠাৎ গামার নাকের কাছে এক পাঞ্চ্ ঝাড়লেন। বিদ্যুৎ-বেগে একটু তফাতে সরতে তাঁর দেরী হয়নি।

ও আল্লাহ্, গামা যেন হঠাৎ আঁৎকে উঠল। তার দুই নাসা-রন্ধ্র চোখের দিকে ঝিলিক খায়। সেই সুযোগে কবি আর এক পাঞ্চ্ চালালেন বাঁ দিকের চোয়ালের উপর নাকের নীচে।

হ্যাচ্চো—হ্যাচ্চো।

গামা হাঁচতে শুরু করেছে। হ্যাচ্চো, হ্যাচ্চো। গামা পা ঠিক রাখতে পারছে না। বার বার নাসা-রন্ধ্র কেঁপে কেঁপে ওঠে তার। বিস্ফারিত মুখ, জিভ পর্যন্ত দেখা যায়। কবি সেই সুযোগে বিদ্যুৎগতি সোজা হুক্ চালান পেটে, মুখের উপর। সব যেন আচম্কা ধাঁই ধাঁই পড়ছে। কারণ, গামার আর লক্ষ্য নেই প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। টলতে শুরু করেছে সে। কবি শেষে এক 'সুইং' ঘুষি ঝাড়লেন। কোমর থেকে ঘোরানো দেহ, দেহভার ডান পা থেকে তখন বাম পায়ে ন্যস্ত। একদম মোক্ষম মার।

গামা পড়ে গেল মঞ্চের উপর মুখ গুজে! আর হাঁচতে লাগল ঘন ঘন। হ্যাচ্চো, হ্যাচ্চো।

অবিশ্বাস্য!

অবিশ্বাস্য!

অসম্ভব, অসম্ভব!

রেফারী গণনা শুরু করেছে। ওয়ান, টু, থ্রি···টেন্···দশ···কিন্তু কে আর উঠবে? একদম নক্ আউট। গামা চিৎপটাং।

পরবর্তী দৃশ্য আপনারা কল্পনা করুন। বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার সেদিন হয়ত ছিল আজ আর নেই। এমন অলৌকিক কাণ্ডের ফিরিস্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়ত দিতে পারতেন। পরবর্তী এক সপ্তাহ গোটা পৃথিবীতে সেই মোজেজার (অলৌকিকতার) জের চলল নানা ভাবে।

আমার কিন্তু পাগল হওয়ার উপক্রম। এই যুগে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কী ভাবে ঘটতে পারে? রবীন্দ্র-ভক্তের দল ক'দিন চীৎকারে শহরে কাক-চিল বসতে দিল না। তেত্রিশ কোটী ঠাকুর থাকা সত্বেও আর একটী ঠাকুর দেশে বাড়ল।

আমার সন্দিগ্ধ মনে কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই থ' পায় না। ব্যাপারটা স্নায়ু-রোগীর অবদমিত ইচ্ছার মত আমার মনে বিকৃতি নিয়ে চেপে বসল। নজরুল ইসলামের কাছে ধাওয়া করেছিলাম। তিনি বললেন, "কবি লড়াইয়ে জিৎবে না ত কে জিৎবে?" এ ত নিজ পেশার সাফাই কীর্তন। তাই একদিন কপাল-ঠোকা কবির বাড়ীতেই হানা দিলাম। জমিদার মানুষ। দেউড়ীর মধ্যে সেঁধোনো কী অত সহজ। সুপারিশ পাকড়ে একদিন সোজা কবির খাস-কামরায় হাজির হওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলাম। "কিসের জন্যে এসেছিস?" সেই মিহি কণ্ঠ আবার নতুন করে শুনলাম। আজ কবির যোদ্ধৃবেশ নেই। পরণে গরদের চেলী, গায়ে রেশমী পাঞ্জাবী, উপরে আলখেল্লা। যীশুখৃষ্ট সদৃশ সাদা দাড়ীর বনে তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখের দিকে আজ তাকাতে পারলাম না।

"আপনাকে দেখতে এসেছি।"

"বেশ বেশ।"

অতিথি-আপ্যায়নের ঘটা গেল কিছুক্ষণ। কয়েক রকমের মিষ্টি তস্তরীতে রাখা। কবি সদ্ব্যবহারের অনুরোধ জানান।

"কিন্তু আমি খাব না।" বেশ দৃঢ় কণ্ঠ অথবা আবদারের সুরে জবাব দিলাম।

"কেন খাবি না?"

"আমার একটা কথার জবাব যদি দেন, তবে আমি খেতে পারি।"

"তোর নাম কী?"

"ইদরীস আলী।"

"তোর ঈদৃশ ব্যবহার কেন? তুই কি জানিস নে অতিথি না খেলে

গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।"
"আমার কথার জবাব না দিলে আমি খাবনা।"
"কি তোর জিজ্ঞাসা ? তুই ত নাছোড়বান্দা, এখন বল্ দেখি।"
"আপনি কী করে বক্সিংয়ে জিৎলেন ?"
"লড়ে জিৎলাম।"
"কিন্তু এ ব্যাখ্যায় মন ভরে না।"
"তুই দেখছি এক নাছোড়-বান্দা। আচ্ছা—", একটু থেমে ইতঃস্তত কাটিয়ে কবিগুরু উচ্চারণ করেন, "তোকে বলতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত—।"
"কি শর্ত, বলুন ?"
"আমার মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরে এই রহস্য তুই আর কারো কাছে ফাঁস করতে পারিস। তার আগে না। ওয়াদা খেলাপ করবি নে ত ?"
"অবিশ্যি না, কবিগুরু।"
"তবে শোন্। গায়ে জোর ত আছে জানিস্। আমার মেহনতের কথা ভেবে দ্যাখ। তোরা ত মজায় পড়িস। কিন্তু আমাকে কী করতে হয় ?"
"বহুৎ, বহুৎ মেহনৎ।"
"বহুৎ আচ্ছা। ঠিক ধরেছিস। তার জন্যে গায়ে তাগদ দরকার হয়। মানুষ মাত্রই বীর্য্যের সাধনা করা উচিত। কিন্তু মুর্খ, গুণ্ডা, সমাজ-বিরোধী জানোয়ারদের মত তোর বল অপরকে দেখানোর জন্যে নয়। তোর বল থাকবে ঢাকা, যেমন পাহাড়ী ফুলে পাহাড়ের গা ঢাকা থাকে। আমি বাইরে নরম। ভেতরে উল্টো। তোরা আমার এমন নকল শুরু করেছিস যে তোদের নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে পুং লিখতে হয়।"
"তা আপনার আশ্রম থেকেই শুরু হয়েছে, কবি-সম্রাট।"
"তা ঠিক। যেতে দে সে-কথা। এখন শোন্। হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম লড়ব। কথা দিয়ে আর পেছানো চলে না। তাই লড়তে গেলাম। গায়ের জোর দেখাতে হোলো। কিন্তু জোরই সব কথা নয়। থোড়া আক্কেলও লাগে। এক রাউণ্ড লড়ার পর মনে মনে ভাবলাম, এই ভাবে বেশীক্ষণ চলবে না। দ্বিতীয় রাউণ্ডে পড়ে গেলাম। তুই ত জানিস। বক্সিংয়ে পড়ে গিয়ে চট করে উঠতে নেই। তা-তে শরীর আরো কাহিল হয়ে

যায়। ধীরে ধীরে উঠতে হয়। তবে দম পাওয়া যায়। তাই উঠতে সেদিন দেরী হচ্ছিল। তখন মাথায় একটা ফন্দী এলো। লুকিয়ে ছাপিয়ে আমাদের কোন না কোন নেশা করতে হয়। মাঝে মাঝে নস্যি নিয়ে থাকি। তখন মনে হোলো নাকে কিছু জমা আছে। ওটা যদি দস্তানা মারফৎ হাজির হয় প্রতিপক্ষের নাকে, তা-হোলে একটা মজা হবে বটে—।"

রবীন্দ্রনাথ তারপর হাসতে থাকেন এবং পরে তা থামিয়ে বলেন, "কাহিনীর আর কি শুনবি? তারপর ত সব নিজের চোখেই দেখেছিস।"

আমি মিষ্টি মুখে ঠেসে তখন কবির হাসির সঙ্গে যোগ দিয়েছি। বিষম খাই আর কী।

কবিগুরু কিন্তু হঠাৎ কিছু গম্ভীর হয়েই ফের বললেন, "শোন্। বল—জোর—এসব শেষ কথা নয় দুনিয়ায়। তা-হলে দুনিয়ায় হাতী, গণ্ডার রাজত্ব করত। যাক্, সে কথা। ওয়াদা খেলাপ করিসনে কিন্তু—।"

"আলবৎ না, কবিগুরু।"

"মনে রাখিস, আমার মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর—।"

ধর্মের দোহাই জবর

বছর দশেক আগে বিলেতে থাকার সময় হঠাৎ আমার সমুদ্র দেখার বাতিক চেগেছিল।

এক উইকেণ্ডে ব্রাইটন শহরে গিয়ে পৌঁছলুম। সমুদ্রের ধারে হঠাৎ এক বৃদ্ধা মহিলা আমার চোখে পড়েছিল। বয়স আশির কাছাকাছি। তার পরণে মেমী ড্রেস। কিন্তু মুখ বাঙালীর। চিনতে বেশী দেরী হয়নি। তাই কৌতূহলে ঢলে পড়লুম। যেচে গিয়ে গায়েপড়া আলাপে আমার এতটুকু বাধেনি।

পরিচয়ে জানা গেল; দেশী মহিলা ত বটেই, আরো আশ্চর্য সমাপতন, বৃদ্ধার বাপের বাড়ী একদম আমাদের জেলায়। অকপট তিনি নাম-ধাম বললেন। আরো জানা গেল, এক ইংরেজকে বিয়ে করে তিনি পঞ্চাশ বছর ওদেশে কাটিয়ে দিয়েছেন। মহিলার নাম মালতী রিচার্ডসন। ওঁর ছেলেরাই এখন বয়সে পঞ্চাশের মুখোমুখি। নাতী-নাতনীরা জোয়ান। আরো অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। বৃদ্ধা মহিলা বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং নেমন্তন্ন করেছিলেন বড় আন্তরিকতার সঙ্গে।

তাঁর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারিনি। দেশে ফিরে কিন্তু কৌতূহলবশতঃ আমি তাঁর জীবন-চরিতের কিছু অংশ যোগাড় করতে পেরেছিলুম।

বৃটিশ আমল। ১৯২০/২১ সন। তখন কালা ইঞ্জিনীয়ার মানে সমাজের মনুমেন্ট বা সাংঘাতিক একটা কিছু।

মালতী রিচার্ডসনের পিতা ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। পি.ডব্লিউ.ডির কণ্ট্রাক্টারী করতেন। নাগ সাহেব হালেচালে সত্যি সাহেব। বিলত-ফেরৎ, চোস্ত্ ইংলিশ কহ্নেওয়ালা। মেয়েদের কনভেণ্ট স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

করেন। এই সব গুণের জন্যে আর বৃটিশ আমলেও তা-কে চাকরী নিতে হয়নি। সাহেব-ঘেঁষা হ'লে কনট্রাক্ট পাওয়া ছিল সহজ। এই জাগতিক হদিস ভদ্রলোকের নিশ্চয় ভাল রপ্ত ছিল। অল্প সময়ে তিনি সাহেব-সুবোদের মধ্যে কেষ্টবিষ্টুরূপে গণ্য হয়ে পড়েন।

সেবার জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন এ্যান্টনী রিচার্ডসন। সদ্য সিভি-লিয়ান। বিজ্ঞানে কেম্ব্রিজের ডাগর-ডাগর ডিগ্রীধারী।

ম্যাজিষ্ট্রেট আর ইঞ্জিনীয়ার খুব ফাঁকাফাঁকি থাকার কথা নয়। সেকালে মফস্বলে মেলামেশার লোক পাওয়া যেত কম। জেলায় ক'টাই বা ইংরেজ অফিসার থাকত? কাজেই দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে দেশী সাহেব ফেল্‌না কিছু নয়। গরজ দুই দিকে। যোগাযোগ ঘটেই যেত।

ইঞ্জিনীয়ার নাগ ত বাবু নন, তিনি মিষ্টার নাগ। সুতরাং যোগ্যে-যোগ্যে মুখ-সৌরভ বিনিময় হয়েছিল।

অবিশ্যি ঘনিষ্টতার এক পর্যায়ে মুখ বদলে গেল।

নাগ সাহেবের তিন মেয়ে: মানসী, মাধবী, মালতী। বয়স অনুযায়ী তারা যথাক্রমে বিশ, আঠার, পনের। তিন জনেই কনভেন্টের ছাত্রী। ইঙ্গ-বঙ্গীয় তরুণী। একজন অবিশ্যি কিশোরী। মানসী ফ্রক ছেড়েছিল বয়স কুড়ি-তে পড়ার পর।

দেশের জলবায়ু বা জৈবিক গুণ, বলা কঠিন, রিচার্ডসন মানসীর প্রেমে পড়ে গেলেন। মানব-মানবীর আকর্ষণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাড়ীতে মিসেস নাগ কোন সনাতন হিন্দু-রমণী ছিলেন না। ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নাগ সাহেব বহুৎ দিন পূর্বে বাড়ী থেকে তুলে দেন। মেয়ের অনুরাগে কে কী আর খারাপ কিছু দেখবে?

তা-ছাড়া আরো ফ্যাক্‌ড়া আছে। অত বাছবিচার করতে গেলে কী কনট্রাক্টার থাকা যায়, না কনট্রাক্টারী মেলে? নাগ সাহেব বরং বেশ উৎসাহিত। তার জানা ছিল, সমাজের মুখে তুমি নুড়ো গুঁজে দিতে পারো, যদি তুমি শহরবাসী হও এবং তোমার অঢেল বিত্ত থাকে। কুড়ি বছরের মেয়ে অবিবাহিত ঘরে রেখে গাঁয়ে বাপ-মার গলা দিয়ে ভাত নামবে না। স্থান-মাহাত্ম্যে নৈতিক এবং সামাজিক অনুশাসন পাত্তা পায়। নচেৎ শাস্ত্রের কথা কেতাবেই লেখা থাকে। এসব জানতেন বৈকি মিস্টার নাগ।

সে-যুগে আকাশ জুড়ে এত এরোপ্লেনের দপাদপি ছিল না। বিশেষ কার্যোপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক-আধবার ধার পেতেন। নাগ-পরিবার কভোবার যে আকাশ-সফর করেছে সেযুগে, নিতান্ত বড় হিসেবের ব্যাপার। ম্যাজিষ্ট্রেট ট্যুরে গেলে সংগে থাকত মানসী।

ওদিক নাগ সাহেব ঠিকাদারীতে ফেঁপে উঠছিলেন। নতুন বাড়ী তৈরী করলেন বিলেতী কায়দায়, যেন 'কান্ট্রি-হাউস।' ম্যাজিষ্ট্রেট-মানসী এক বৃত্তের অধিবাসী। বাড়ীর সবাই ভাবছে, যে-কোন দিন রিচার্ডসন 'প্রপোজ' করবে। কোর্টশিপ আর কদিন চালু থাকবে? এখন শুধু প্রস্তাবের অপেক্ষা। রিচার্ডসন বড় দেরী করছিলেন। অবিশ্যি তা-তে ক্ষতি কী? ওদের ছুটী ত বাঁধা হয়েই গেছে।

গ্রীষ্মকালে সেবার রিচার্ডসন দার্জিলিং গেলেন। সঙ্গে মানসী। সাহেব আর ছুটি নিয়ে হোমে যাননি। একমাস শৈলবিহার করে ফিরলেন ভাবী-পত্নীসহ।

বড় দেরী হয়ে যাচ্ছিল। নাগ-সাহেব বড় অধৈর্য হয়ে উঠলেন। অবিশ্যি গুমরে গুমরে। রিচার্ডসনও বোধ হয় ভাবছিলেন, দেরী করা উচিত নয়। বদ্-নসীব। তিন দিনের ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মানসী হঠাৎ মরে গেল।

বাড়ীর লোক যত কাঁদলে তার বিশ গুণ অশ্রুপাত করলেন রিচার্ডসন। তিন দিন অফিসই গেলেন না। মানসীর সঙ্গে তোলা ফটো নিজের বেডরুমে ঝুলিয়ে রাখলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রতিদিন রাশ রাশ ফুলের অঞ্জলি উৎসর্গীত তার নীচে। বেচারা বিলেতী সাহেব ফুলের মত শুকিয়ে গেল ক'দিনে।

দুঃখ-শোক হচ্ছে পানা পুকুরে ঢেলা ফেলার মত। পানা সরে যায় ঢেলার মহিমায়। কিন্তু কিছু সময় কেটে গেলে পানা-পুকুর আবার যথা পানা-পুকুর। কোথাও কোন ফাঁক ছিল ধরা কঠিন। নাগ-রিচার্ডসনের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটল। অবিশ্যি সময় গেল প্রায় বছর দুই।

প্রাথমিক টাট্‌কা ঘা শুকাতে লাগল। কালক্রমে দাগে পরিণত হোল। যন্ত্রণা আর তেমন রইল না। কোথাও কোথাও নতুন মাংস গজাতে লাগল। ঈশ্বরের কৃপা, এবার রিচার্ডসন মাধবীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। স্বস্তি-নিঃশ্বাস ফেললেন নাগ সাহেব। নিজ নেটিভ সমাজে তাঁর দর কমে

গেছে। খামখা অপবাদের রেহাই আর মাথতে হবে না। বৃটিশ আমলের ম্যাজিস্ট্রেট। তার পাটরাণী হওয়া ত নসীবের কথা।

গোটা নাগ পরিবার ধনদৌলতে উচ্ছল। নাগ সাহেব প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য পর্য্যন্ত হলেন। পরিবারের সকলে এক গ্রীষ্মে য়ুরোপ ঘুরে এলো, রিচার্ডসন যখন ছুটিতে 'হোম'-এ যান। সে-যুগে বিশেষতঃ গরমের দিনে দার্জিলিঙ নাগ-পরিবারের কাছে হয়ে পড়েছিল পাঁদাড়। টেম্পারেচার একটু বাড়লে মাধবী আর শহরে থাকে না। দিদির অবিকল প্রতিনিধিরূপে তা-কে কল্পনা করা যায়। রিচার্ডসন আবার 'হেভেন' (স্বর্গ) ফিরে পেয়েছেন। ডাঁশিয়ে উঠেছে মাধবী। এমন মৌসুমেই ত তার দিদির বরাত খুলেছিল। অন্যান্য ফিরিস্তি অবান্তর।

মোদ্দা কথা, অন্তর্স্রোত আবার নতুন বেগে প্রবাহিত। তার মুখে পুরাতন স্মৃতি খড়কুটোর মত ভেসে গেল।

সোমত্ত মাধবী।

তার এবার বিয়ে দিতে হয়। কোর্টশিপের রশি বড় লম্বা হয়ে যাচ্ছে। নাগ-সাহেব তাই আশঙ্কিত। গতবার বিলম্ব হেতু মানসী-কে হারাতে হয়েছিল। গোয়াল-পোড়া গরু বিদ্যুৎ-চমকে ভীত। নাগ-সাহেব এবার বেশী দেরী করতে রাজী নন। শুভস্য শীঘ্রম। নেটিভ প্রবাদটি তাঁ-কে বেশ ধাক্কা দিচ্ছিল।

সবই ত ঠিক আছে। এখন শুধু রিচার্ডসনের দিক থেকে প্রস্তাব আগমনের অপেক্ষা। কিন্তু অপর পক্ষ নগাধিরাজ। নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। নাগ সাহেব প্রমাদ গুণলেন। অস্বোয়াস্তি বেজায়। হবু-শ্বশুরের পক্ষে এসব গ্রন্থী উন্মোচন শোভন নয়। অন্য কোন সুপারিশ? কিন্তু ফ্যামিলি সিক্রেট (পারিবারিক গোপনীয়তা) বলে একটা জিনিস ভদ্র সমাজে চালু আছে। অন্যের উপর ভার দেওয়া আউট-অফ-কোস্‌চেন, প্রশ্নাতীত।

ভয়ানক মানসিক চাঞ্চল্য এবং দোলাচল ভাবের মুখোমুখি হলেন নাগ সাহেব। বেশ কয়েক মাসের রগ্‌ড়ানি। শেষে স্থির করলেন, আর দেরী হতে দেবেন না। দেশী প্রবাদ প্রতি মুহূর্তে হানা দিতে লাগল: শুভস্য শীঘ্রম।

কয়েকদিন পর নাগ সাহেব রিচার্ডসন-কে ডিনারে নিমন্ত্রন করলেন। খুব জোর নানাপদী খানাপিনা শেষ হোলো। হুইস্কির মৌতাতে বলীয়ান

নাগ সাহেব এটাসেটা ধানাইপানায়ের পর আসল জায়গায় হাত রাখলেন।

গদগদ-মাখা সম্বোধন, "মিঃ রিচার্ডসন্?"

—ইয়েস, মিঃ নাগ।

—এ ওয়ার্ড ফর ইউ (আপনার জন্যে সামান্য কথা)।

—প্লিজ।

সংলাপ অবিশ্যি ইংলিশ জবানে। বাংলায় তার প্রতিধ্বনি বা সারমর্ম সহজে ধরা যায়। পরবর্তী বাক্য মিঃ নাগ প্রায় এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছিলেন।

—মিঃ রিচার্ডসন, মাধবী আপনার অনুরাগিনী। আপনি ওকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। মানসীকে চেয়েছিলেন ঈশ্বর তা-কে নিয়ে গেলেন।

নিরুত্তর রিচার্ডসন পাথর, বসে রইলেন। রাম-রহিম মুখই খুললেন না। বসে রইলেন ত রইলেন।

ওদিকে আর এক এক নিরেট পাথরের মূর্তি মিষ্টার নাগ ঘামছেন রীতিমত। শুধু জবাবের অপেক্ষায়।

রিচার্ডসন পনের মিনিট নির্বাক। যেন কাটা শাল-গুঁড়ি।

অগত্যা নাগ সাহেব-কে আবার মুখ খুলতে হোলো, "আপনার কোন অসুবিধা আছে, স্যার?"

—না।

—তবে—। আপনার মতামত শুনতে চাই। এ ত আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। আপনার উপর কোন জবরদস্তি নেই।

রিচার্ডসন আরো দশ মিনিট মৌনব্রত অবলম্বন করে রইলেন। শেষে কাচুমাচু হোচট খেতে খেতে জবাব দিলেন, "মিঃ নাগ, আমি পূর্বে আপনাকে বলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি—।"

—কেন, স্যার?

—আমি এক ডায়লেমায় (উভয়সঙ্কটে) পড়েছি।

—আমাকে পরিষ্কার বলুন। আমি আপনার সাহায্যে আসব।

—কিছু দিন আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি।

—কী স্বপ্ন, স্যার?

—আমি মাধবী-কে ভালবাসি। তা-তে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি

স্বপ্নে দেখলাম মানসী-কে (তার আত্মার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। সে আমাকে বললে, আমার ছোট বোন মালতীর ভেতর আমার রিবার্থ (পুনর্জন্ম) হয়েছে। আমার সব ওম্যান্‌হুড (নারীত্ব) নিয়ে এখন আমি আমার বোনের আত্মার ভেতর আছি। তুমি ওকে বিয়ে করো। আমার কথা খেলাপ করো না। উপর-উপরি তিন দিন দেখলাম একই স্বপ্ন। স্বপ্নের ব্যাপারে পৃথিবীর সব ধর্ম এক। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণী।

দুই পক্ষ একদম নিঝ্‌ঝুম। এবার প্রথমে মুখ খুললেন রিচার্ডসন।

—মিঃ নাগ, এখন আমি কী করব?

—আপনি কী চান, স্যার?

—আমি মালতী-কে স্ত্রীরূপে পেতে চাই। (উইল দ্যাট বী ফেয়ার) তা-কী শোভন হবে?

নাগ সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। একদম বজ্রাহত। কিন্তু বহু দিনের ঝানু কন্ট্রাক্টার জানেন, জগৎ ভাব-প্রবণতা নয়। সব ফস্কে যেতে পারে। নিজ সমাজ থেকে দূরে-দূরে থাকলেও এদেশের বাসিন্দা তিনি। শেষে বললেন, "মিঃ রিচার্ডসন তবে তা-ই হোক। ইটস্ গড্‌স্ উইশ। এ ভগবানেরই ইচ্ছা। আমেন।"

তারপর মালতী ও রিচার্ডসনের সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেল এক হপ্তার মধ্যে।